رئاسة الشؤون الدينية
بالمسجد الحرام والمسجد النبوي

التَّحْقِيقُ وَالإِيضَاحُ لِكَثِيرٍ مِنْ مَسَائِلِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ وَالزِّيَارَةِ عَلَى ضَوءِ الكِتَابِ وَالسُّنَّة

বাংলা

بنغالي

হজ্জ, ‘উমরাহ এবং যিয়ারাতের বিভিন্ন মাসআলা সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ।

সম্মানিত শাইখ আল্লামা
আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায

التَّحْقِيقُ وَالإِيضَاحُ لِكَثِيرٍ مِنْ مَسَائِلِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ وَالزِّيَارَةِ عَلَى ضَوءِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

হজ্জ, 'উমরাহ এবং যিয়ারাতের বিভিন্ন মাসআলা সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ।

لِسَمَاحَةِ الشَّيْخِ العَلَّامَةِ
عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَازٍ
رَحِمَهُ اللهُ

সম্মানিত শাইখ আল্লামা
আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায
রহিমাহুল্লাহ

بِسْمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ

লেখকের ভূমিকা

সকল প্রশংসা জগতসমূহের রব আল্লাহর জন্য। উত্তম পরিণাম শুধুমাত্র মুত্তাকীদের জন্য। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদের উপর এবং তার সকল পরিবার-পরিজন এবং সাহাবীদের উপর।

অতঃপর:

এটি হজ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা, যেখানে হজের ফযীলত, আদব এবং যারা হজ পালনের উদ্দেশ্যে সফর করবেন, তাদের করণীয় সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়াও, হজ, 'উমরাহ ও যিয়ারাতের গুরুত্বপূর্ণ অনেক বিষয় সংক্ষেপে ও স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আমি এখানে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ দ্বারা নির্দেশিত বিষয়গুলো অনুসরণ করার চেষ্টা করেছি। আমি এটি মুসলিমদের জন্য নসীহতস্বরূপ এবং আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণীর উপরে আমল করার নিমিত্তে সংকলন করেছি:

﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ٥٥﴾

আর আপনি উপদেশ দিতে থাকুন, কারণ নিশ্চয় উপদেশ মুমিনদের উপকারে আসে। [আয-যারিয়াত: ৫৫] এবং আল্লাহর

বাণী:

﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ...﴾

স্মরণ করুন, যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল আল্লাহ তাদের প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন: 'অবশ্যই তোমরা তা মানুষের কাছে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করবে এবং তা গোপন করবে না।' [আলে ইমরান: ১৮৭] আয়াতটি শেষ পর্যন্ত। তিনি আরো বলেছেন:

﴿...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى...﴾

নেককাজ ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পর সাহায্য করবে [আল-মায়েদা: ২]

এছাড়াও সহীহ হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন:

«الدِّينُ النَّصِيحَةُ، ثَلَاثًا، قِيلَ: لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ».

"দীন হচ্ছে নসীহত, তিনি তিনবার বললেন। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো: হে আল্লাহর রাসূল, কার জন্য? তিনি বললেন: আল্লাহর জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য, মুসলিম শাসকদের জন্য এবং তাদের জনসাধারণের জন্য।"[1].

ইমাম ত্বাবারানী বর্ণনা করেছেন যে, হুযাইফা রদিয়াল্লাহু আনহু

[1] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং (৫৫)।

থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«مَنْ لَمْ يَهْتَمَّ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ، وَمَنْ لَمْ يُصْبِحْ وَيُمْسِ نَاصِحًا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِإِمَامِهِ وَلِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ».

"যে ব্যক্তি মুসলিমদের বিষয় সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে না, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর যে ব্যক্তি সকাল ও সন্ধ্যায় আল্লাহ, তাঁর রাসূল, তাঁর কিতাবসহ ঐ ব্যক্তির ইমাম (শাসক) এবং সাধারণ মুসলিমদের জন্য নসীহতকারী (কল্যাণকামী) না হয়, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।"[1]

আল্লাহর নিকট প্রার্থনা, তিনি যেন এটিকে আমার ও সকল মুসলিমের জন্য উপকারী করেন এবং এই প্রচেষ্টাকে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ করে দেন। এটিকে নি'আমাতপূর্ণ জান্নাতে প্রবেশের একটি মাধ্যম করে দিন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা ও দু'আ কবুলকারী। তিনিই আমাদের জন্য যথেষ্ট, এবং তিনিই সর্বোত্তম কর্মবিধায়ক।

[1] তাবরানী, আল-আওসাত, হাদীস (৭৪৬৯)

অধ্যায়:

হজ ও ‘উমরাহ ওয়াজিব হওয়া এবং উভয়টি দ্রুত সম্পন্নকরণের অত্যাবশ্যকীয়তা সম্পর্কিত দলীলসমূহের আলোচনা সম্পর্কে

যেহেতু এটা জানা গেল, তাহলে আরো জেনে রাখুন যে– আল্লাহ তা‘আলা আমাকে ও আপনাদেরকে হক জানা ও মানার তাওফিক দান করুন– নিশ্চয় মহান আল্লাহ স্বীয় বান্দার প্রতি তাঁর পবিত্র ঘরের হজ্জ করাকে ওয়াজিব করেছেন এবং এটাকে ইসলামের অন্যতম রুকন হিসেবে ধার্য করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿...وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾

আর মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ঐ ঘরের হজ্ব করা তার জন্য অবশ্য কর্তব্য। আর যে কেউ কুফরী করল সে জেনে রাখুক, নিশ্চয় আল্লাহ সৃষ্টিজগতের মুখাপেক্ষী নন। [আলে ইমরান: ৯৭]

ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে সহীহ বুখারী ও মুসলিমে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ

اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ بَيْتِ اللَّهِ الحَرَامِ».

(ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি: এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই এবং নিশ্চয় মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল, সালাত কায়েম করা, যাকাত দেয়া, রমজানের সিয়াম পালন করা এবং বায়তুল্লায় হজ করা।)[1]

সা'ঈদ বিন মানসূর তার সুনানে উমার ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: "আমি এই শহরগুলোতে একদল পর্যবেক্ষক প্রেরণের কথা চিন্তা করছি, তারা যাচাই করবে- যাদের হজ করার সামর্থ্য আছে কিন্তু তারা হজ করেনি, তাদের উপর জিজিয়া (কর) আরোপ করবে। (কেননা) তারা মুসলিম হতে পারে না। তারা মুসলিম হতে পারে না।"[23]

আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন: "যে ব্যক্তির হজ করার সামর্থ থাকা সত্ত্বেও হজ পরিত্যাগ করল, সে ইহুদী অথবা খ্রিস্টান হয়ে মৃত্যুবরণ করুক, তার কোন সমস্যা

---

[1] সহীহ বুখারী (নং: ০৮), সহীহ মুসলিম (নং: ১৬)।

[2] এটি জামি'উল আহাদীস গ্রন্থে (৩১২২১) নম্বরে সুনানু সাঈদ ইবনু মানসুরের উদ্ধৃতিসহ উল্লেখ করা হয়েছে, তবে আমি এটি প্রচলিত সংস্করণে খুঁজে পাইনি।

[3] অর্থাৎ: আর্থিক সামর্থ।

নেই।”.[1]

যে ব্যক্তির হজ করার সামর্থ থাকার পরেও হজ করেনি, তার উপর দ্রুত হজ সম্পন্ন করা ওয়াজিব। কারণ ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«تَعَجَّلُوا إِلَى الحَجِّ - يَعْنِي الفَرِيضَةَ - فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ».

“তোমরা -ফরয- হজ দ্রুত সম্পন্ন করো। কারণ, তোমাদের কেউ জানে না যে, কখন তার উপরে কী অসুবিধা বা প্রতিবন্ধকতা আপতিত হবে।”[2]

তাছাড়া যেহেতু আল্লাহর ঘরে পৌঁছাতে সক্ষম ব্যক্তির জন্য তাৎক্ষণিকভাবে হজ আদায় করা ওয়াজিব, আল্লাহ তা‘আলার এই আয়াতের বাহ্যিক অর্থের ভিত্তিতে:

﴿...وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾

আর মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ঐ ঘরের হজ্ব করা তার জন্য অবশ্য কর্তব্য। আর যে কেউ কুফরী করল সে জেনে রাখুক, নিশ্চয় আল্লাহ

---

[1] তিরমিযী, হাদীস নং (৮১২)

[2] আবূ দাউদ, হাদীস নং (১৭৩২)।

সৃষ্টিজগতের মুখাপেক্ষী নন। [সূরা আলে ইমরান: ৯৭] এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষণে বর্ণিত বক্তব্যের ভিত্তিতে:

«أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الحَجَّ فَحُجُّوا».

“হে মানুষ, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপরে হজকে ফরয করেছেন, সুতরাং তোমরা হজ করো।”[1]

‘উমরাহ আদায় করা ওয়াজিব হওয়ার পক্ষে কিছু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে:

তন্মধ্যে: জিবরীল আলাইহিস সালাম যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইসলাম সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন, তখন উত্তরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন:

«الإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَحُجَّ البَيْتَ وَتَعْتَمِرَ، وَتَغْتَسِلَ مِنَ الجَنَابَةِ، وَتُتِمَّ الوُضُوءَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ».

“ইসলাম হল তুমি সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। তুমি সালাত প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত আদায় করবে, আল্লাহর ঘরে হজ ও উমরা করবে, নাপাকী থেকে গোসল করবে ও পূর্ণরূপে অযু করবে এবং রমযান মাসে সিয়াম পালন করবে।”[2] ইবনু খুযায়মাহ ও দারাকুত্বনী উমার ইবনুল খাত্ত্বাব রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন।

---

[1] সহীহ মুসলিম (নং: ১৩৩৭)।

[2] ইবনু খুযাইমা, (নং ০১)।

দারাকুত্বনী বলেছেন: এটা সহীহ সনদে সাব্যস্ত হাদীস।

আরেকটি হাদীস হল: আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন:

«يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ عَلَى النِّسَاءِ مِنْ جِهَادٍ؟ قَالَ: عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ: الْحَجُّ وَالعُمْرَةُ».

“হে আল্লাহর রাসূল, নারীদের উপরে কি কোনো জিহাদ ফরয? তিনি বললেন: তাদের উপরে এমন একটি জিহাদ ফরয করা হয়েছে, যাতে কোনো লড়াই নেই। আর তা হল হজ ও ‘উমরাহ।”[1] আহমাদ ও ইবনু মাজাহ সহীহ সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

হজ ও ‘উমরাহ জীবনে একবারের বেশী পালন করা ওয়াজিব নয়। এর দলীল হল সহীহ হাদীসে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্য:

«الحَجُّ مَرَّةٌ، فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ».

“হজ একবারই (আবশ্যক)। যে একাধিকবার করবে, তার জন্য এটা নফল।”[2]

নফল হজ ও ‘উমরাহ বেশি বেশি পালন করা সুন্নত। দলীল হল সহীহাইনে বর্ণিত আবু হুরায়রা রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস, তিনি বলেছেন: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস (১৫২০)।

[2] সুনানে নাসায়ী (নং: ২৬২০)।

বলেছেন:

«العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الجَنَّةُ».

"এক উমরাহ থেকে অপর উমরাহ তার মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহের জন্য কাফফারাহ স্বরূপ। আর মাবরূর হজের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া কিছু নয়।"[1]

অধ্যায়

পাপ থেকে তাওবাহ করা ও জুলুম থেকে মুক্ত হওয়ার অপরিহার্যতা সম্পর্কে

যখন মুসলিম ব্যক্তি হজ অথবা 'উমরার সফরের ব্যাপারে দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে, তখন তার জন্য তার পরিবার ও বন্ধুদেরকে আল্লাহর তাক্বওয়া অবলম্বনের অসীয়ত করা মুস্তাহাব। তাক্বওয়া হল: আল্লাহর আদেশসমূহ পালন করা ও নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ পরিহার করা।

তার উচিত হল, তার অপরিশোধিত ঋণ ও সম্পদের বিবরণী লিখে যাওয়া, আর উক্ত কাজটি সাক্ষীর উপস্থিতিতে সম্পাদন করা। তার উপরে ওয়াজিব হল তাৎক্ষণিকভাবে সকল প্রকার গুনাহ থেকে খাঁটি তাওবাহ করা। এর দলীল হল আল্লাহ

[1] সহীহ বুখারী (নং: ১৭৭৩), সহীহ মুসলিম (নং: ১৩৪৯)।

তা‘আলার বাণী:

﴿...وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

হে মুমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে আস, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।’ [আন-নূর: ৩১]

প্রকৃত তাওবা হল: গুনাহ থেকে বের হয়ে আসা ও তা পরিত্যাগ করা, অতীতের গুনাহের ব্যাপারে লজ্জিত হওয়া, পুনরায় গুনাহ না করার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা। যদি তার উপরে কোনো মানুষের ব্যক্তিগত অথবা সম্পদ বা মর্যাদা সম্পর্কিত কোনো অধিকারে যুলুমের অভিযোগ থাকে, তাহলে সেই অধিকার প্রাপ্য ব্যক্তিকে পরিশোধ করে দিবে। অন্যথায় (ক্ষমা চেয়ে) সফরের পূর্বে উক্ত যুলুম থেকে নিজেকে দায়মুক্ত করে নিবে। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত যে, তিনি বলেছেন:

«مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ مَالٍ أَوْ عِرْضٍ فَلْيَتَحَلَّلِ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ».

“যে ব্যক্তি তার (কোনো মুসলিম) ভাইয়ের ওপর তার সম্পদ বা সম্ভ্রম বিষয়ে যুলুম করেছে, সে যেন আজই তার কাছে (ক্ষমা চেয়ে) হালাল করে নেয় ঐ দিন আসার পূর্বে যেদিন দীনার ও দিরহাম কিছুই থাকবে না। তার যদি কোন নেক আমল থাকে, তবে তার যুলুমের পরিমাণ অনুযায়ী তা থেকে নিয়ে নেওয়া হবে।

আর যদি তার নেকী না থেকে, তবে তার (মযলূম) সঙ্গীর পাপরাশি নিয়ে তার (যালিমের) ওপর চাপিয়ে দেওয়া হবে।”[1]

তার জন্য করণীয় হল তার হজ ও ‘উমরাহর জন্য হালাল সম্পদ থেকে উৎকৃষ্ট মানের সম্পদ বাছাই করবে। এর দলীল হল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সাব্যস্ত সহীহ হাদীস, তিনি বলেছেন:

«إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا».

“নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র, তিনি পবিত্র বস্তু ছাড়া গ্রহণ করেন না।”,[2]

ত্বাবারানী আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ حَاجًّا بِنَفَقَةٍ طَيِّبَةٍ وَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الغَرْزِ فَنَادَى: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، نَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، زَادُكَ حَلَالٌ، وَرَاحِلَتُكَ حَلَالٌ، وَحَجُّكَ مَبْرُورٌ غَيْرُ مَأْزُورٍ، وَإِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ بِالنَّفَقَةِ الخَبِيثَةِ فَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الغَرْزِ فَنَادَى: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، نَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: لَا لَبَّيْكَ وَلَا سَعْدَيْكَ، زَادُكَ حَرَامٌ، وَنَفَقَتُكَ حَرَامٌ، وَحَجُّكَ غَيْرُ مَبْرُورٍ».

“যখন কোনো ব্যক্তি হজের উদ্দেশ্যে পবিত্র সম্পদ সাথে নিয়ে বের হয়, এরপরে তার পা বাহনের উপরে রাখে এবং এই ঘোষণা

[1] সহীহ বুখারী (নং: ২৪৪৯)।

[2] সহীহ মুসলিম, হাদীস (১০১৫)।

দেয়: লাব্বাইক, আল্লাহুম্মা লাব্বাইক। তখন আসমান থেকে একজন ঘোষক তাকে ডেকে বলেন: তোমার আহবান (তালবীয়া) কবুল হয়েছে, তুমি সৌভাগ্যবান। তোমার পাথেয় হালাল, তোমার বাহন হালাল। তোমার হজ কবুল হওয়ার যোগ্য ও ত্রুটিমুক্ত। আর যখন কোনো ব্যক্তি হারাম সম্পদ সাথে নিয়ে বের হয়, এবং বাহনে তার পা রেখে ঘোষণা দেয়: লাব্বাইক, আল্লাহুম্মা লাব্বাইক। তখন আসমান থেকে একজন ঘোষক ঘোষণা করেন: তোমার আহবান কবুল হয়নি আর তুমি হতভাগা। তোমার পাথেয় হারাম, তোমার সম্পদ হারাম আর তোমার হজও কবুলযোগ্য নয়।"[1]

হাজীর উচিত হল অন্য মানুষের হাতে থাকা সম্পদ থেকে নিজেকে বিমুখ রাখা এবং তাদের নিকট চাওয়া থেকে বিরত থাকা; কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ».

"যে ব্যক্তি নিজেকে গুনাহ থেকে বিরত রাখতে চায়, আল্লাহ তাকে বিরত রাখেন। আর যে অন্য ব্যক্তির কাছে অমুখাপেক্ষী থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে অমুখাপেক্ষী করে দেন।" ,[2]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন:

---

[1] তাবরানী, আল-মু'জামুল কাবীর (২৯৮৯)

[2] সহীহ বুখারী (নং: ১৪২৭), সহীহ মুসলিম (নং: ১০৩৫)।

«لَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ».

"যে ব্যক্তি সর্বদা মানুষের নিকট চাইতেই থাকে, সে কিয়ামাতের দিবসে এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তার চেহারায় এক টুকরা গোশতও থাকবে না।"[1]

হাজীর জন্য ওয়াজিব হল সে তার হজ ও 'উমরাহর নিয়তের সময় আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাত প্রাপ্তির উদ্দেশ্য করবে। হজের পবিত্র স্থানগুলোতে আল্লাহর পছন্দনীয় কথা ও কাজসমূহ পালনের দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের ইচ্ছা পোষণ করবে। হজের সময় পরিপূর্ণভাবে দুনিয়া ও দুনিয়ার তুচ্ছ বস্তু, লৌকিকতা ও খ্যাতি, এবং দুনিয়াবী বিষয় নিয়ে অহংকার করা থেকে নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করে রাখবে। কারণ, এটা সবচেয়ে নিকৃষ্ট উদ্দেশ্য, এবং তা আমল নষ্ট হওয়া ও কবুল না হওয়ার কারণ। যেমনটি আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ۝١٥ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝١٦﴾

যে কেউ দুনিয়ার জীবন ও তার শোভা কামনা করে, দুনিয়াতে আমরা তাদের কাজের পূর্ণ ফল দান করি এবং সেখানে তাদেরকে

---

[1] সহীহ বুখারী (নং: ১৪৭৪), সহীহ মুসলিম (নং: ৪০৪০)।

কম দেয়া হবে না।

তাদের জন্য আখিরাতে আগুন ছাড়া অন্য কিছুই নেই এবং তারা যা করেছিল আখিরাতে তা নিস্ফল হবে। আর তারা যা করত তা ছিল নিরর্থক। [হুদ : ১৫-১৬]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন:

﴿مَّن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ۞ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا ۞﴾

কেউ আশু সুখ-সম্ভোগ কামনা করলে আমরা যাকে যা ইচ্ছে এখানেই সত্বর দিয়ে থাকি; পরে তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত করি যেখানে সে শাস্তিতে দগ্ধ হবে নিন্দিত ও অনুগ্রহ হতে দূরীকৃত অবস্থায়।

আর যে ব্যক্তি পরকালের ইচ্ছা করে এবং তার জন্য যথাযথ চেষ্টা করে এবং সে মুমিন হয়, তবে তাদের চেষ্টা প্রশংসিত হয়। [সূরা আল-ইসরা : ১৮-১৯]

বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ مَعِي فِيهِ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ».

"আল্লাহ তাআলা বলেন: আমি সমস্ত অংশীদারদের চাইতে

অংশীদারী [শিরক] থেকে অধিক অমুখাপেক্ষী। যদি কেউ এমন কাজ করে যাতে সে আমার সাথে অন্য কাউকে শরীক করে, আমি তাকে ও তার শিরককে বর্জন করি।”[1]

তার আরো কর্তব্য হচ্ছে তার সফরে সে অনুগত্যশীল, তাকওয়াবান ও দীনের গভীর জ্ঞানসম্পন্ন উত্তম ব্যক্তিদের সাহচর্য গ্রহণ করবে এবং নির্বোধ ও পাপী ব্যক্তিদের থেকে সতর্ক থাকবে।

এছাড়াও তার উচিত হজ ও ‘উমরাহ সম্পর্কিত শরী‘আতসম্মত বিষয়গুলি শেখা, সেগুলো সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করা এবং যে বিষয়গুলো তার কাছে অস্পষ্ট, সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা; যাতে সে সুস্পষ্ট জ্ঞানের ওপর থাকতে পারে। যখন সে নিজের বাহনে—হোক তা উট, গাড়ী, বিমান বা অন্য কোন বাহন—আরোহন করবে, তখন তার জন্য আল্লাহর নাম নেওয়া, তাঁর প্রশংসা করা, এরপর তিনবার তাকবীর (আল্লাহু আকবার) বলা মুস্তাহাব। এরপর সে বলবে:

﴿...سُبْحَانَ الَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ۝١٣ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ۝١٤﴾

পবিত্র-মহান তিনি, যিনি এগুলোকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন। আর আমরা সমর্থ ছিলাম না এদেরকে বশীভূত

---

[1] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং (২৯৮৫)।

করতে।

‘আর নিশ্চয় আমারা আমাদের রবের কাছেই প্রত্যাবর্তনকারী।’ ১৪ [আয-যুখরুফ: ১৩-১৪]

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِي سَفَرِي هَذَا البِرَّ وَالتَّقْوَى، وَمِنَ العَمَلِ مَا تَرْضَى، اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا، وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ المَنْظَرِ، وَسُوءِ المُنْقَلَبِ فِي المَالِ وَالأَهْلِ».

অর্থ: “হে আল্লাহ, নিশ্চয় আমি আমার এ সফরে কল্যাণ, তাকওয়া এবং আমলের মধ্যে যাতে আপনি সন্তুষ্ট হন এমন আমলের প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ, আপনি আমাদের উপর সফরকে হালকা করে দিন, দূরত্বকে ঘুচিয়ে দিন। হে আল্লাহ, আপনি সফরে আমাদের সঙ্গী, আমাদের পরিবারের খলীফা (দায়িত্বশীল)। হে আল্লাহ, নিশ্চয় আমি আপনার কাছে সফরের কাঠিন্যতা, ভয়ঙ্কর দৃশ্য এবং আমাদের সম্পদ ও পরিবারের দুর্ভাগ্যে নিপতিত হওয়া থেকে আশ্রয় কামনা করছি।”;[1]

কারণ, এটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সহীহসূত্রে সাব্যস্ত হয়েছে। যা ইমাম মুসলিম ইবনু ‘উমার রদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন।

হাজীর উচিত সে যেন তার সফরে অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকির, ইস্তিগফার, দু‘আ ও কাকুতি-মিনতি করে, কুরআন

---

[1] সহীহ মুসলিম, হাদীস (১৩৪২)

তিলাওয়াত ও তার অর্থ অনুধাবন করে। জামাআতে সালাত আদায়ে যত্নবান থাকে, অনর্থক কথা ও অতিরিক্ত কৌতুক থেকে তার জিহ্বাকে সংযত রাখে। সে যেন মিথ্যা, গীবত, চোগলখুরি এবং সঙ্গী বা অন্যান্য মুসলিম ভাইদের প্রতি উপহাস করা থেকেও বিরত থাকে।

তার উচিত সঙ্গীদের প্রতি সদাচরণ করা, তাদের থেকে যে কোন কষ্ট বা ক্ষতিকর জিনিস দূরে রাখা এবং সামর্থ্য অনুযায়ী হিকমত (জ্ঞানপূর্ণ উপায়) ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে তাদেরকে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করা।

অধ্যায়

মীকাতের কাছে পৌঁছে হাজীর করণীয় সংক্রান্ত

যখন সে মীকাতে পৌঁছে যাবে, তখন তার জন্য গোসল করা ও সুগন্ধি ব্যবহার করা মুস্তাহাব। কারণ, বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরামের সময় সেলাইযুক্ত পোশাক পরিত্যাগ করেছেন এবং গোসল করেছেন। এছাড়াও, সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত রয়েছে যে, আয়েশা রদিয়াল্লাহু আনহা বলেছেন:

«كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِحَلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالبَيْتِ».

“আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার

ইহরামের জন্য ইহরামে প্রবেশের আগে সুগন্ধি লাগিয়ে দিতাম এবং হালাল হওয়ার জন্য বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করার আগেও অনুরূপ করতাম"।[1] আর আয়িশা রদিয়াল্লাহু আনহা উমরাহর জন্য ইহরাম বাঁধার পরে হায়েযগ্রস্ত হয়ে পড়লে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে গোসল করে হজের ইহরাম বাঁধতে আদেশ করেছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসমা বিনতু উমাইসকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, যখন তিনি 'যুল-হুলাইফাহ' নামক স্থানে সন্তান প্রসব করেন, তখন তিনি যেন গোসল করে নেন, একটি কাপড় দিয়ে রক্ত বন্ধ করেন এবং ইহরাম বাঁধেন। এটি প্রমাণ করে যে, যদি কোনো নারী মীকাতে পৌঁছানোর সময় ঋতুবতী বা নেফাসগ্রস্ত থাকে, তবে সে গোসল করবে, অন্যান্য হাজীদের সাথে ইহরাম বাঁধবে এবং হাজীদের অন্যান্য সকল কাজ করবে, শুধু বাইতুল্লাহ-তে তাওয়াফ করবে না, যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়িশা ও আসমাকে আদেশ করেছিলেন।[2]

ইহরাম বাঁধতে ইচ্ছুক ব্যক্তির জন্য মুস্তাহাব হচ্ছে: সে যেন তার গোঁফ, নখ, লজ্জাস্থানের চুল এবং বগলের চুল পরিষ্কার করে, যা কাটা প্রয়োজন, তা ইহরামের আগেই কেটে ফেলে, যাতে

[1] সহীহ বুখারী (নং: ১৫৩৯), সহীহ মুসলিম (নং: ১১৮৯)।

[2] সহীহ মুসলিম, হাদীস (১২১৮)।

ইহরামের পরে তা কাটার প্রয়োজন না হয়, কারণ তখন তা নিষিদ্ধ। এছাড়াও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিমদের জন্য সর্বদা এসব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে যত্ন নিতে বলেছেন। যেমন সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে, আবু হুরাইরা রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«الفِطْرَةُ خَمْسٌ: الخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَقَلْمُ الأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الإِبْطِ».

"পাঁচটি বিষয় ফিতরাতের অন্তর্ভুক্ত: খাতনা করা, লজ্জাস্থানের চুল কেটে ফেলা, গোঁফ ছোট করা, নখ কাটা এবং বগলের চুল মুণ্ডন করা।",[1]

সহীহ মুসলিমে আনাস ইবনু মালিক রদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন:

«وَقَّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ، وَقَلْمِ الأَظْفَارِ، وَنَتْفِ الإِبْطِ، وَحَلْقِ العَانَةِ: أَنْ لَا نَتْرُكَ ذَلِكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً».

"আমাদের জন্য গোঁফ ছোট করা, নখ কেটে ফেলা, বগলের চুল উপড়ে ফেলা এবং নাভীর নিচের লোম কেটে ফেলার নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছিল, তা হল: যেন আমরা চল্লিশ দিনের বেশী তা ছেড়ে না দেই।"[2]

---

[1] সহীহ বুখারী (নং: ৫৮৯১), সহীহ মুসলিম (নং ২৫৭)।

[2] সহীহ মুসলিম, হাদীস (২৫৮)।

এটি নাসায়ীও বর্ণনা করেছেন এই শব্দে:

«وَقَّتَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ».

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের জন্য মীকাত (স্থান) নির্ধারণ করে দিয়েছেন।”[1] এটি আহমাদ, আবু দাউদ এবং তিরমিযী বর্ণনা করেছেন, তবে নাসায়ীর শব্দে। আর ইহরামের সময় মাথা থেকে কিছু কাটার কোনো বিধান নেই, তা পুরুষের ক্ষেত্রেই হোক অথবা নারীর।

আর দাড়ির ক্ষেত্রে, সর্বদাই পুরোপুরি শেভ করা (মুণ্ডন করা) বা কিছু অংশ কাটা নিষেধ। বরং, দাড়ি বাড়তে দেওয়া এবং তা পূর্ণ করে রাখা ওয়াজিব। এর প্রমাণ হলো, সহীহ বুখারী ও মুসলিম-এ ইবনু উমার রদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত হাদীস, যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ، وَفِّرُوا اللِّحَى، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ».

"মুশরিকদের বিপরীত আচরণ ধারণ করো, দাড়ি বড় রাখো এবং গোঁফ ছোট করো।"[2] সহীহ মুসলিমে আবু হুরাইরা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

«جُزُّوا الشَّوَارِبَ، وَأَرْخُوا اللِّحَى، خَالِفُوا الْمَجُوسَ».

[1] নাসাঈ, হাদীস (১৪)।

[2] সহীহ বুখারী (নং: ২৮৯২), সহীহ মুসলিম (নং: ২৫৯)।

"গোঁফ ছোট করো এবং দাড়ি বড় রাখো; অগ্নিপূজকদের (মাজুসীদের) বিরোধিতা করো।"[1]

বর্তমান যুগে এ মুসীবত অনেক বড় রূপ ধারণ করেছে যে, অনেক মানুষ এই সুন্নাহর বিরোধিতা করছে, দাড়ি রাখার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করছে, এবং কাফির ও নারীদের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণে সন্তুষ্ট রয়েছে। বিশেষত যারা নিজেদের আলেম বা শিক্ষিত বলে পরিচয় দেয়। إنا لله وإنا إليه راجعون (আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমরা তাঁরই দিকে ফিরে যাব।) আমরা আল্লাহর কাছে দু'আ করি, যেন তিনি আমাদের এবং সকল মুসলমানকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ অনুযায়ী চলার, তা দৃঢ়ভাবে ধারণ করার এবং এর দিকে মানুষকে আহ্বান করার তাওফীক দান করেন, যদিও অধিকাংশ মানুষ তা থেকে বিমুখ। আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনিই সর্বোত্তম কর্মবিধায়ক। আর সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্য একমাত্র মহান ও মহানুভব আল্লাহর কাছ থেকেই আসে।

তারপর পুরুষ ব্যক্তি ইযার (কোমরের চাদর) এবং রিদা (উপরের চাদর) পরিধান করবে। উভয়টি সাদা এবং পরিষ্কার হওয়া উচিত। তার সাথে স্যান্ডেল পরা মুস্তাহাব, কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

---

[1] সহীহ মুসলিম (নং: ২৬০)।

«وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ».

"আর তোমাদের কেউ ইহরাম বাঁধতে চাইলে, সে একটি ইযার, একটি রিদা এবং দুটি স্যান্ডেল পরিহিত অবস্থায় ইহরাম বাঁধবে। যদি সে স্যান্ডেল না পায়, তাহলে সে মোজা পরবে এবং সেগুলো কেটে নেবে যেন তা টাখনুর নিচে থাকে।"[1] হাদীসটি ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেছেন।

আর নারীর জন্য যে কোনো রঙের পোশাকে ইহরাম বাঁধা জায়িয, কালো, সবুজ বা অন্য কোনো রঙ হোক না কেন। তবে তাকে অবশ্যই পুরুষদের পোশাকের সঙ্গে সাদৃশ্য থেকে বেঁচে থাকতে হবে। তবে ইহরাম অবস্থায় মহিলার জন্য নিকাব (মুখ ঢাকার কাপড়) ও হাত মোজা পরা জায়িয নয়। বরং সে নিকাব ও হাত মোজা ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে তার মুখ ও হাত ঢেকে রাখবে। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহরিম নারীকে নিকাব ও হাত মোজা পরতে নিষেধ করেছেন। যেসব সাধারণ মানুষ মনে করে যে, মহিলার ইহরাম কেবল সবুজ বা কালো রঙের পোশাকে হওয়া উচিত, তাদের এ ধারণার কোনো ভিত্তি নেই।

এরপর গোসল, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং ইহরামের পোশাক

[1] সহীহ মুসলিম, হাদীস (১১৭৭)।

পরিধান করার পর, ব্যক্তি তার অন্তরে হজ বা ‘উমরাহর জন্য ইহরামে প্রবেশের নিয়ত করবে। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى».

“নিশ্চয়ই আমলসমূহ নিয়তের উপর নির্ভরশীল। আর প্রত্যেক মানুষের জন্য তার নিয়ত অনুযায়ী প্রতিফল রয়েছে।”[1]

তার জন্য নিয়তের উচ্চারণ করাও শরীয়তসম্মত। যদি তার নিয়ত হয় উমরাহ, তাহলে সে বলবে: “লাব্বাইকা উমরাতান” অথবা “আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা উমরাতান” যার অর্থ: (হে আল্লাহ! আমি উমরাহ পালনের জন্য হাজির)।

আর যদি তার নিয়ত হয় হজ পালন, তাহলে বলবে: “লাব্বাইকা হাজ্জান” অথবা “আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা হাজ্জান” যার অর্থ: (হে আল্লাহ! আমি হজ্জ পালনের জন্য হাজির)।

আর যদি সে উমরাহ ও হজ একসঙ্গে পালনের নিয়ত করে, তাহলে বলবে: “আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা উমরাতান ওয়া হাজ্জান’ যার অর্থ: (হে আল্লাহ! আমি উমরাহ ও হজ্জ উভয়ের জন্য হাজির)।

সর্বোত্তম হলো, মুহরিম ব্যক্তি তার বাহনে -যেমন: উট, গাড়ি বা অন্য কিছুতে আরোহন করে এটা উচ্চারণ করবে; কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এমনটাই করেছেন— তিনি তাঁর

---

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং (১) এবং মুসলিম, হাদীস নং (১৯০৭)।

বাহনে বসার পর এবং সেটি মীকাত থেকে চলতে শুরু করার পরই তালবিয়া পাঠ করেছেন। এটাই আলেমদের সবচেয়ে বিশুদ্ধ মত।

ইহরামের ক্ষেত্রে নিয়তের উচ্চারণ করা শরী'আতসম্মত, তবে অন্যান্য ইবাদতে নয়; কারণ, কেবলমাত্র এটিই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত হয়েছে।

অন্যদিকে সালাত, তাওয়াফ এবং অন্যান্য ইবাদতের সময় নিয়ত মুখে উচ্চারণ করা উচিত নয়। তাই কেউ যেন না বলে: "আমি এই নামাজ পড়ার নিয়ত করছি", বা "আমি অমুক তাওয়াফ করার নিয়ত করছি"। বরং নিয়ত মুখে উচ্চারণ করা একটি বিদ'আত।

এটি উচ্চস্বরে বলা আরও নিন্দনীয় ও গুরুতর গুনাহের কাজ। যদি নিয়ত উচ্চারণ করা শরী'আতসম্মত হত, তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা স্পষ্টভাবে বলে দিতেন বা করে দেখাতেন, এবং সালাফে সালেহীনরা তাতে অগ্রসর হতেন।

যখন এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বা তার সাহাবীগণ রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে এটি বর্ণিত হয়নি, তখন বুঝা গেল যে এটি বিদআত। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«وَشَرُّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ».

“আর সবচেয়ে নিকৃষ্টতম কাজ হচ্ছে নবসৃষ্ট বিষয়সমূহ, আর প্রতিটি বিদ‘আতই ভ্রষ্টতা।”[1] সহীহ মুসলিম। নবী আলাইহিস সালাম বলেছেন:

«مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ».

“যে ব্যক্তি আমাদের এ দীনে নতুন কিছু আবিষ্কার করল যা তাতে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত।”[2] সহীহ বুখারী ও মুসলিম। সহীহ মুসলিমের শব্দে এসেছে:

«مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ».

“যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করলো যাতে আমাদের নির্দেশনা নেই, তা প্রত্যাখ্যাত হবে।”[3]

অধ্যায়

স্থানগত মীকাত ও তা নির্দিষ্টকরণ সংক্রান্ত

মীকাত পাঁচটি:

এক: যুল হুলাইফাহ, এটি মদীনাবাসীদের মীকাত। বর্তমানে মানুষের কাছে এটি “আবয়ারে আলী” নামে পরিচিত।

দুই: জুহফা, এটি শামবাসীদের মীকাত, রাবিগ নামক অঞ্চলের পরে একটি বিরান গ্রাম। মানুষেরা বর্তমান সময়ে রাবিগ নামক

[1] সহীহ মুসলিম, হাদীস (৮৬৭)।

[2] সহীহ বুখারী (নং: ২৬৯৭), সহীহ মুসলিম (নং: ১৭১৮)।

[3] সহীহ বুখারী, হাদীস (২৫৫০), সহীহ মুসলিম, হাদীস (১৭১৮)।

অঞ্চল থেকে ইহরাম বেঁধে থাকে। আর যে ব্যক্তি রাবিগ থেকে ইহরাম বাঁধবে সে মীকাত থেকে ইহরাম বেঁধেছে বলেই গণ্য হবে, কেননা রাবিগ মূলত জুহফা থেকে কিছুটা সামনে।

তিন: কারনুল মানাযিল, এটি নাজদবাসীদের মীকাত, বর্তমানে এটিকে 'সাইল' বলা হয়।

চার: ইয়ালামলাম, এটি ইয়ামানের অধিবাসীদের মীকাত।

পাঁচ: যাতু 'ইরক, এটি ইরাকবাসীদের মীকাত।

এ মীকাতগুলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্ধারণ করেছেন উল্লিখিত ব্যক্তিদের জন্য এবং সেসব লোকদের জন্য যারা হজ বা উমরাহ করতে ইচ্ছুক এবং এ মীকাতগুলো অতিক্রম করবে।

যে কেউ এই মীকাতগুলো অতিক্রম করবে, তার জন্য সেখান থেকেই ইহরাম বাঁধা বাধ্যতামূলক। যদি কেউ মক্কার উদ্দেশ্যে হজ বা উমরাহ করার নিয়তে যায়, তবে ইহরাম ছাড়া মীকাত অতিক্রম করা তার জন্য হারাম, হোক তা স্থলপথে অথবা আকাশ পথে। এর কারণ হলো, যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই মীকাতগুলো নির্ধারণ করেন, তখন তিনি সাধারণভাবেই বলেছেন:

«هُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ، مِمَّنْ أَرَادَ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ».

"এই মীকাতগুলো তাদের (উল্লেখিত অঞ্চলের অধিবাসীদের) জন্য এবং এমন যে কোন ব্যক্তির জন্যও, যে তাদের অঞ্চলভুক্ত

না হলেও, হজ বা উমরাহ করার উদ্দেশ্যে সেখান দিয়ে যায়।"[1]

যে ব্যক্তি আকাশ পথে মক্কার উদ্দেশ্যে হজ বা উমরাহ করতে যাচ্ছে, তার জন্য শরী'আতসম্মত হলো: বিমানে উঠার আগে গোসল ও অন্যান্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা। যখন মীকাতের নিকট পৌঁছাবে, তখন ইযার ও রিদা পরিধান করবে এবং উমরাহর ইহরাম বাঁধবে যদি যথেষ্ট সময় থাকে। কিন্তু যদি সময় স্বল্প থাকে, তাহলে হজের ইহরাম বাঁধবে। যদি কেউ বিমানে ওঠার আগেই বা মীকাতের নিকট আসার আগেই ইযার ও রিদা পরে নেয়, তবে এতে কোনো সমস্যা নেই। তবে নিয়ত করা এবং লাব্বাইক পাঠ করবে না যতক্ষণ না সে মীকাত বরাবর পৌঁছে বা তার কাছাকাছি হয়। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মীকাত থেকেই ইহরাম বাঁধতেন। আর উম্মাতের জন্য দীনের অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় তার অনুসরণ করাই আবশ্যক, যেমনটি আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ...﴾

অবশ্যই তোমাদের জন্য রয়েছে রাসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম আর্দশ... [আল-আহযাব, আয়াত: ২১] তাছাড়া যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজে বলেছেন:

«خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ».

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস (১৫২৪), সহীহ মুসলিম, হাদীস (১১৮১)।

“তোমরা আমার কাছ থেকে হজের নিয়ম গ্রহণ কর।”[1]

আর যে ব্যক্তি মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হয় কিন্তু হজ বা ‘উমরাহর নিয়ত করে না, যেমন: ব্যবসায়ী, কাঠুরে, ডাক-বাহক বা অনুরূপ কোন কাজে যাওয়া ব্যক্তি, তার জন্য ইহরাম বাধ্যতামূলক নয়। তবে যদি সে ইহরাম ধারণ করতে চায়, তাহলে তা করতে পারে।

কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্বোক্ত হাদীসে মীকাতসমূহ নির্ধারণ করে বলেছেন:

«هُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ، مِمَّنْ أَرَادَ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ».

“এই মীকাতগুলো তাদের (উল্লেখিত অঞ্চলের অধিবাসীদের) জন্য এবং এমন যে কোন ব্যক্তির জন্যও, যে তাদের অঞ্চলভুক্ত না হলেও, হজ বা ‘উমরাহ করার উদ্দেশ্যে সেখানে উপস্থিত হয়।”[2] এর অর্থ হলো: যে ব্যক্তি মীকাত অতিক্রম করে কিন্তু হজ বা ‘উমরাহর নিয়ত করে না, তার জন্য ইহরাম বাধ্যতামূলক নয়।

এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর বান্দাদের প্রতি এক বিশেষ রহমত ও সহজকরণ। তাই এ জন্য আমরা আল্লাহর প্রশংসা ও শুকরিয়া আদায় করি। এর সমর্থনে আরও একটি প্রমাণ হলো: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কা বিজয়ের বছরে

---

[1] সহীহ মুসলিম, হাদীস (১২৯৭)।

[2] প্রাগুক্ত।

সেখানে প্রবেশ করেছিলেন, তখন তিনি ইহরাম বাঁধেননি। বরং তিনি মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন মাথায় লোহার টুপি (মিগফার) পরিহিত অবস্থায়, কারণ তখন তার উদ্দেশ্য হজ বা 'উমরাহ ছিল না; বরং মক্কা বিজয় এবং সেখান থেকে শিরক ও মূর্তিপূজা নির্মূল করা।

আর যারা মীকাতগুলোর ভেতরে বসবাস করে, যেমন: জেদ্দা, উম্মু সালাম, বাহরাহ, আশ-শারায়ি', বদর, মাস্তুরাহ এবং অনুরূপ এলাকাগুলোর অধিবাসীরা, তাদের জন্য এই পাঁচটি নির্দিষ্ট মীকাতের কোনো একটিতে গিয়ে ইহরাম বাঁধা আবশ্যক নয়। বরং তাদের নিজ নিজ বসবাসের স্থানই তাদের জন্য মীকাত হিসেবে গণ্য হবে। তারা সেখান থেকেই হজ বা 'উমরাহর ইহরাম বাঁধবে। তবে, যদি তাদের অন্য কোনো আবাসস্থান থাকে, যা মীকাতের বাইরে অবস্থিত, তাহলে তাদের জন্য ইখতিয়ার (দু'টি বিকল্প) রয়েছে, ইচ্ছে করলে তারা মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধতে পারে, অথবা তাদের নিকটস্থ বসবাসের স্থান থেকে ইহরাম বাঁধতে পারে, যা মীকাতের তুলনায় মক্কার কাছাকাছি। কেননা, ইবনু আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মীকাতগুলোর আলোচনা করেন, তখন তিনি সাধারণভাবেই বলেছেন:

«فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ، فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ، وَكَذَلِكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْ مَكَّةَ».

"যারা এই মীকাতগুলোর ভেতরে বাস করে, তাদের ইহরামের স্থান হলো তাদের নিজ নিজ বসবাসস্থল। এমনকি মক্কার অধিবাসীরাও মক্কা থেকেই ইহরাম বাঁধবে।"[1][2] সহীহ বুখারী ও মুসলিম।

কিন্তু যে ব্যক্তি হারামে রয়েছে কিন্তু ‘উমরাহর নিয়ত করেছে, তার উপরে আবশ্যক হচ্ছে, সে হিল তথা হারামের সীমানার বাইরে বের হয়ে যাবে, এরপরে সেখান থেকে ‘উমরাহর ইহরাম বাঁধবে; কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আয়িশা রদিয়াল্লাহু আনহা যখন ‘উমরাহর অনুমতি চেয়েছিলেন, তখন তিনি তার ভাই আব্দুর রহমানকে তাকে নিয়ে হিল-এর দিকে যেয়ে সেখান থেকে ইহরাম বাঁধার আদেশ করেছিলেন। এটা প্রমাণ করে যে, ‘উমরাহ আদায়কারী ব্যক্তি ‘উমরাহর ইহরাম হারাম থেকে করবে না, বরং সে হিল থেকে ইহরাম বাঁধবে।

এই হাদীসটি ইবনু আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহুমার পূর্বোক্ত হাদীসকে খাস করে, এবং এটা আরো প্রমাণ করে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ কথা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে:

«حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْ مَكَّةَ».

---

[1] পূর্ববর্তী হাদীসের অংশবিশেষ।

[2] তার ইহরামের স্থান, তথা: যেখানে থেকে সে তালবিয়া পাঠ করে ইহরামে প্রবেশ করবে।

“এমনকি মক্কাবাসীরা মক্কা থেকে ইহরাম বাঁধবে।”[1] এখানে উদ্দেশ্য হজের জন্য ইহরাম বাঁধা, ‘উমরাহর জন্য নয়। কেননা, যদি হারামের ভেতর থেকে ‘উমরাহর ইহরাম বাঁধা বৈধ হতো, তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়িশা রদিয়াল্লাহুকে হারামের ভেতর থেকেই ইহরাম বাঁধার অনুমতি দিতেন এবং তাকে হিল এলাকায় বের হওয়ার দায়িত্ব দিতেন না। এটি একটি সুস্পষ্ট বিষয়। আর অধিকাংশ আলেমদের মত এটিই, এছাড়াও এ বিধানই একজন মুমিনের জন্য অধিক সাবধানতার পথ; কারণ এতে উভয় হাদীসের উপর আমল করা সম্ভব হয়। আল্লাহই সর্বোত্তম তাওফীক দাতা।

কিছু মানুষের হজের পর বারবার ‘উমরাহ করার অভ্যাস রয়েছে, তা তানয়ীম, জি’রানাহ বা অন্য যেকোনো স্থান থেকে হোক, যদিও তারা হজের আগে ইতোমধ্যেই ‘উমরাহ করেছে। কিন্তু এর কোনো শরী‘আতসম্মত ভিত্তি নেই। বরং দলীল থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, এটি না করাই উত্তম। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবীগণ রদিয়াল্লাহু আনহুম হজের পর আর ‘উমরাহ করেননি। তবে আয়িশা রদিয়াল্লাহু আনহা তানয়ীম থেকে ‘উমরাহ করেছিলেন, কারণ, তিনি মক্কায় প্রবেশের সময় হায়িযগ্রস্ত থাকায় সাধারণ হাজীদের সঙ্গে ‘উমরাহ করতে

[1] প্রাগুক্ত।

পারেননি, এ কারণে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অনুরোধ করেন, যাতে তিনি তার মীকাত থেকে যে ‘উমরাহর ইহরাম বেঁধেছিলেন, তার পরিবর্তে আরেকটি ‘উমরাহ করতে পারেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর অনুরোধ গ্রহণ করেন। ফলে আয়িশা রদিয়াল্লাহু আনহার দুটি ‘উমরাহ সম্পন্ন হয়, প্রথমটি: হজের সাথে সম্পন্নকৃত ‘উমরাহ এবং দ্বিতীয়টি: এই পৃথকভাবে করা ‘উমরাহ। তাই যে ব্যক্তি আয়িশা রদিয়াল্লাহু আনহার মত একই পরিস্থিতিতে পড়বে, তার জন্য হজের পর ‘উমরাহ করা দোষণীয় নয়। কারণ, এতে শরী‘আতের দলীলসমূহের মাঝে সমন্বয় হয় এবং মুসলিমদের জন্যও বিষয়টি প্রশস্ত হয়।

নিশ্চয়ই হজ সম্পন্ন করার পর নতুন করে ‘উমরাহ করার প্রবণতা— যা সেই ‘উমরাহর অতিরিক্ত, যার মাধ্যমে হাজীরা মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন—, এটি সবার জন্য কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে। এতে প্রচণ্ড ভীড় ও দুর্ঘটনার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়, পাশাপাশি এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত ও তার অনুসৃত পথের বিরোধী। আল্লাহই সর্বোত্তম তাওফীক দাতা।

অধ্যায়

যে ব্যক্তি হজের মাসের বাইরে মীকাতে পৌঁছায়, তার হুকুম সম্পর্কে

জেনে রাখুন, মীকাতে পৌঁছানো ব্যক্তির দুটি অবস্থা হতে পারে:

প্রথম অবস্থা: যদি কেউ হজের মাস ব্যতীত মীকাতে পৌঁছে, যেমন: রমাদান বা শা'বান মাসে, তাহলে তার জন্য সুন্নাত হলো 'উমরাহর ইহরাম বাঁধা। সে অন্তরে 'উমরাহর নিয়ত করবে এবং মুখে উচ্চারণ করবে: "লাব্বাইকা 'উমরাতান" অথবা "আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা 'উমরাতান"। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেখানো তালবিয়া পড়বে, যা নিম্নরূপ:

«لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ».

"আমি হাযির হে আল্লাহ! আমি হাযির, আমি হাযির; আপনার কোনো অংশীদার নেই, আমি হাযির। নিশ্চয় সকল প্রশংসা ও সকল নি'আমত আপনার এবং কর্তৃত্ব আপনারই, আপনার কোনো অংশীদার নেই।" ([1] সে অধিক পরিমাণে এই তালবিয়াহ পড়তে থাকবে এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার যিকির করবে, যতক্ষণ না কা'বায় পৌঁছে। যখন কা'বায় পৌঁছবে, তখন তালবিয়া বন্ধ করবে এবং কা'বা শরীফের চারপাশে সাত চক্করে তাওয়াফ করবে। এরপর মাকামে ইবরাহীমের পেছনে দুই রাক'আত সালাত আদায় করবে। তারপর সাফা পাহাড়ের দিকে যাবে এবং সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মধ্যে সাতবার সায়ী সম্পন্ন করবে।

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস (১৫৪৯), সহীহ মুসলিম, হাদীস (১১৮৪)।

এরপর মাথার চুল মুন্ডন করবে অথবা ছাঁটবে। এর মাধ্যমে তার ‘উমরাহ পূর্ণ হবে এবং ইহরামের কারণে যেসব জিনিস তার জন্য হারাম ছিল, সেগুলো আবার হালাল হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় অবস্থা: হজের মাসসমূহে মীকাতে উপস্থিত হবে, হজের মাস হচ্ছে: শাওয়াল, যিল-কা‘দাহ এবং যিল-হজের প্রথম দশদিন।

এ জাতীয় লোকেরা তিনটি বিষয়ের মধ্যে যে কোন একটি করার অনুমতি পাবে, ১) শুধুমাত্র হজ আদায় করবে, ২) শুধুমাত্র ‘উমরাহ আদায় করবে অথবা ৩) হজ ও ‘উমরাহ একসাথে আদায় করবে। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বিদায় হজের সময় যিলকদ মাসে মীকাতে পৌঁছেছিলেন, তখন তিনি তার সাহাবীদেরকে এই তিনটি বিষয়ের মধ্যে যে কোনো একটি বেছে নেওয়ার অনুমতি দেন। তবে যার সঙ্গে কোরবানি করার জন্য কোনো হাদী নেই, তার জন্য সুন্নাত হলো ‘উমরাহর ইহরাম বাঁধা এবং তার উচিত সেগুলি সম্পন্ন করা, যেগুলি অন্য সময়ে মীকাতে পৌঁছানো ব্যক্তির জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাহাবীদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, যখন তারা মক্কার নিকটবর্তী হবেন, তখন যেন তারা নিজেদের ইহরামকে ‘উমরাহর জন্য নির্দিষ্ট করেন। মক্কায় পৌঁছানোর পর তিনি তাদেরকে পুনরায় এ ব্যাপারে উৎসাহিত

করেন। তাই তারা নবীজির নির্দেশ অনুযায়ী তাওয়াফ করেন, সায়ী করেন, চুল ছোট করেন এবং ইহরাম থেকে মুক্ত হয়ে যান। তবে যাদের সঙ্গে কোরবানির হাদী (কুরবানির পশু) ছিল, তাদের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়েছিলেন, যেন তারা ইহরাম অবস্থায়ই থাকে এবং কেবল যিলহজের ১০ তারিখ (ইয়াওমুন নাহর) কোরবানীর দিন ইহরাম থেকে মুক্ত হয়। আর যে ব্যক্তি কোরবানির পশু সঙ্গে নিয়ে আসবে, তার জন্য সুন্নাত হলো—হজ ও 'উমরাহর সম্মিলিত ইহরাম (কিরান) বাঁধা। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও এভাবে ইহরাম বেঁধেছিলেন, তখন তিনি কোরবানির পশু সঙ্গে নিয়েছিলেন। এছাড়া, যেসব সাহাবী কেবল 'উমরাহর ইহরাম বেঁধেছিলেন কিন্তু কোরবানির পশুও সঙ্গে এনেছিলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তারা যেন 'উমরাহর তালবিয়ার সাথে হজের তালবিয়াও পাঠ করে এবং হজ ও 'উমরাহ সম্পন্ন না করা পর্যন্ত ইহরামমুক্ত না হয়। আর যদি কোনো ব্যক্তি শুধুমাত্র হজের ইহরাম বেঁধে থাকে এবং কোরবানির পশু সঙ্গে নিয়ে আসে, তাহলে তারও উচিত—এই ইহরামে অবিচল থাকা এবং যিলহজ্জের ১০ তারিখ (কোরবানির দিন) ইহরামমুক্ত হওয়া, ঠিক কিরান হজ পালনকারীর মতো।

এ থেকে বোঝা যায় যে, যে ব্যক্তি শুধু হজের জন্য বা হজ ও

‘উমরাহর সম্মিলিত ইহরাম (কিরান) বেঁধেছে, কিন্তু তার সঙ্গে কোরবানির পশু নেই, তার জন্য ইহরামে থাকা উচিত নয়। বরং তার জন্য সুন্নাত হলো—তার ইহরামকে ‘উমরাহতে পরিণত করা, অর্থাৎ তাওয়াফ করা, সাফা-মারওয়ায় সায়ী করা, চুল ছোট করা বা মুন্ডানো এবং ইহরামমুক্ত হওয়া, যেভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাহাবীদের মধ্যে যারা কোরবানির পশু সঙ্গে আনেননি, তাদেরকে এভাবেই করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তবে, যদি কেউ হজের সময় কম থাকার কারণে আশঙ্কা করে যে, ইহরাম খুললে হয়তো সে হজ করতে পারবে না, কেননা সে দেরীতে উপস্থিত হয়েছে, তাহলে তার জন্য ইহরামে অবিচল থাকা দোষণীয় নয়। আল্লাহই সর্বোজ্ঞ।

আর যদি কোনো ব্যক্তি আশঙ্কা করে যে, সে তার হজ বা ‘উমরাহ সম্পন্ন করতে পারবে না—যেমন, অসুস্থতা, শত্রুর ভয় বা অন্য কোনো কারণে— তাহলে তার জন্য মুস্তাহাব হলো ইহরামের সময় এই শর্ত করা: "যদি কোনো বাধা আমাকে আটকায়, তবে আমি যেখানে বাধাপ্রাপ্ত হব, সেখানেই ইহরামমুক্ত হয়ে যাব।" এটি প্রমাণিত হয়েছে দুবা‘আহ বিনতে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহার ঘটনাতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলেছিলেন: "হে আল্লাহর রাসূল! আমি হজ করতে চাই, কিন্তু আমি অসুস্থ।" নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছিলেন:

«حُجِّي وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي».

"হজ করো, তবে এ মর্মে শর্ত করো যে, যদি কোনো বাধা আমাকে আটকায়, তবে আমি যেখানেই বাধাপ্রাপ্ত হব, সেখানেই ইহরামমুক্ত হয়ে যাব।"[1] মুত্তাফাকুন 'আলাইহি।

এ শর্তের উপকারিতা হচ্ছে: যদি কোনো ব্যক্তি ইহরাম বাঁধার পর এমন কোনো বাধার সম্মুখীন হয়, যা তাকে হজ বা 'উমরাহ সম্পন্ন করতে বাধা দেয়, যেমন: অসুস্থতা বা শত্রুর দ্বারা বাঁধাপ্রাপ্ত হওয়া , তাহলে সে ইহরামমুক্ত হতে পারবে এবং তার উপর কোনো কাফফারা বা জরিমানা লাগবে না।

অধ্যায়

বাচ্চাদের হজ কী ইসলামের ফরয হজের ক্ষেত্রে যথেষ্ট হবে?

ছোট ছেলে বা মেয়ের হজ বিশুদ্ধ হয়। কারণ, সহীহ মুসলিমে ইবন আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত আছে যে, এক নারী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এক শিশুকে তুলে ধরে বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল, এর জন্য কি হজ রয়েছে?" তিনি বললেন,

---

[1] প্রাগুক্ত।

«نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ».

"হ্যাঁ, আর তোমার জন্য রয়েছে সওয়াব।"।[1]

এছাড়াও সহীহুল বুখারীতে এসেছে, সায়িব ইবনু ইয়াযিদ রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: "আমাকে সাত বছর বয়সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হজের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।"[2] তবে ইসলামের ফরয হজ হিসেবে তাদের উভয়ের জন্য উক্ত হজটি যথেষ্ট হবে না।

এভাবে দাস-দাসীদের পক্ষ থেকেও হজ সহীহ হবে, তবে তা ইসলামের ফরয হজ হিসেবে গণ্য হবে না; কারণ ইবনু আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত হাদীসের দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

«أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ، ثُمَّ بَلَغَ الحِنْثَ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةً أُخْرَى، وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ، ثُمَّ أُعْتِقَ، فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى».

"যে কোনো শিশু হজ করে, তারপর যখন প্রাপ্তবয়স্ক হয়, তখন তার ওপর আরেকটি হজ করা আবশ্যক। এবং যে কোনো দাস হজ করে, তারপর মুক্তি পায়, তারও আরেকটি হজ করা আবশ্যক।"[3] ইবনু আবী শাইবাহ এবং বায়হাকী হাসান সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

---

[1] সহীহ মুসলিম, হাদীস (১৩৩৬)।

[2] সহীহ বুখারী (নং: ১৮৫৮)।

[3] ইবনু আবী শাইবাহ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন (খ৪/৪৪৪)।

এরপর যদি শিশু তারতম্য বোঝার বয়সের নিচে থাকে, তাহলে তার অভিভাবক তার পক্ষ থেকে ইহরামের নিয়ত করবে, তাকে সেলাইযুক্ত পোশাক থেকে মুক্ত করবে এবং তার পক্ষ থেকে লাব্বাইক পড়বে। এর মাধ্যমে সেই শিশু ইহরামে প্রবেশ করবে এবং প্রাপ্তবয়স্ক মুহরিমের জন্য নিষিদ্ধ বিষয়গুলো তার জন্যও নিষিদ্ধ হয়ে যাবে। একইভাবে যদি কোনো মেয়ে শিশু তারতম্য বোঝার বয়সের নিচে থাকে, তাহলে তার অভিভাবকও তার পক্ষ থেকে ইহরামের নিয়ত করবে, তার পক্ষ থেকে লাব্বাইক পড়বে এবং সে ইহরামে প্রবেশ করবে। ফলে প্রাপ্তবয়স্ক মহিলাদের জন্য যা নিষিদ্ধ, তার জন্যও তা নিষিদ্ধ হবে। এছাড়াও তাদের (শিশুদের) কাপড় ও শরীর পাক-পবিত্র থাকা উচিত, বিশেষ করে তাওয়াফের সময়, কারণ তাওয়াফ সালাতের ন্যায় এবং এর বিশুদ্ধতার জন্য পবিত্রতা শর্ত।

যদি ছেলেশিশু বা মেয়েশিশু বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে প্রাপ্তবয়স্ক (তারতম্য বোঝার বয়সে উপনীত) হয়ে থাকে, তাহলে তারা তাদের অভিভাবকের অনুমতি নিয়ে নিজে থেকেই ইহরাম বাঁধবে এবং ইহরামের সময় প্রাপ্তবয়স্কদের মতোই গোসল ও সুগন্ধি ইত্যাদি ব্যবহার করবে। এখানে "অভিভাবক" বলতে সেই ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে, যিনি তাদের দেখাশোনা করেন এবং তাদের কল্যাণের জন্য দায়িত্ব পালন করেন, তা তিনি তাদের

বাবা, মা বা অন্য যে কেউ হোন না কেন। যে কাজ তারা করতে অক্ষম, যেমন: পাথর নিক্ষেপ ইত্যাদি, সেগুলো তাদের অভিভাবক তাদের পক্ষ থেকে সম্পন্ন করবে। তবে বাকি সমস্ত বিধান, যেমন: আরাফায় অবস্থান, মিনা ও মুযদালিফায় রাত্রি যাপন, তাওয়াফ ও সায়ী ইত্যাদি কাজগুলো তাদের নিজেদেরই পালন করতে হবে। আর যদি তারা তাওয়াফ ও সায়ী করতে অক্ষম হয়, তাহলে তাদেরকে বহন করে তাওয়াফ ও সায়ী করাতে হবে। তবে তাদের বহনকারী ব্যক্তির জন্য উত্তম হলো, সে তার নিজের তাওয়াফ ও সায়ীকে তাদের তাওয়াফ ও সায়ীর সাথে মিলিয়ে না নেয়া; বরং সে তাদের জন্য পৃথকভাবে তাওয়াফ ও সায়ী করার নিয়ত করবে এবং নিজের জন্যও স্বতন্ত্রভাবে তাওয়াফ ও সায়ী করবে। এটি ইবাদাতের ক্ষেত্রে অধিক সতর্কতার সাথে আমল করার জন্য এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিম্নোক্ত হাদীস শরীফ অনুযায়ী আমল করার জন্য, হাদীসটি হচ্ছে:

«دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ».

“যে বিষয়ে তোমার সন্দেহ হয়, তা ছেড়ে দিয়ে যাতে সন্দেহের সম্ভাবনা নেই তা গ্রহণ কর।”[1] যদি কোনো ব্যক্তি (মা বা অভিভাবক) কোনো শিশুকে বহন করে তাওয়াফ করে এবং সেই তাওয়াফ তার নিজের ও শিশুটির পক্ষ থেকেও করার নিয়ত

---

[1] তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন (নং: ২৫১৮)।

করে, তাহলে বিশুদ্ধতম মত অনুযায়ী তা যথেষ্ট হবে। কারণ, যখন এক নারী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শিশুর হজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তখন তিনি তাকে শিশুর জন্য আলাদাভাবে তাওয়াফ করার নির্দেশ দেননি। যদি এটি বাধ্যতামূলক হতো, তাহলে তিনি অবশ্যই তা স্পষ্ট করে দিতেন। আর আল্লাহই সর্বোত্তম তাওফীক দাতা।

বোঝার বয়সে উপনীত ছেলে ও মেয়ে বাচ্চাকে তাওয়াফ শুরুর আগে প্রাপ্তবয়স্ক ইহরামধারীর মতই পবিত্রতা রক্ষা করার আদেশ করা হবে -অর্থাৎ: তারা যেন অযু ও গোসল করে এবং নাপাকি থেকে পবিত্র হয়ে তাওয়াফ করে। তবে ছোট ছেলে বা ছোট মেয়ের জন্য তাদের অভিভাবকের পক্ষ থেকে ইহরাম বাঁধা আবশ্যক নয়; বরং এটি একটি নফল (অতিরিক্ত) বিষয়। যদি অভিভাবক তাদের জন্য ইহরাম বাঁধেন, তাহলে তিনি সওয়াব পাবেন, আর যদি না করেন, তবে তার কোনো গুনাহ নেই। আল্লাহই ভাল জানেন।

অধ্যায়

ইহরামের নিষিদ্ধ কাজসমূহ এবং মুহরিম ব্যক্তির জন্য বৈধ বিষয়াবলীর বর্ণনা

ইহরামের নিয়ত করার পরে পুরুষ হোক অথবা নারী, তার জন্য চুল কাটা বা ছোট করা, নখ কাটা বা সুগন্ধি ব্যবহার করা

জায়িয নয়।

একজন পুরুষ ইহরামের অবস্থায় সম্পূর্ণরূপে সেলাই করা পোশাক পরতে পারবে না, অর্থাৎ: এমন কোনো পোশাক পরতে পারবে না, যা তার শরীরের জন্য নির্দিষ্টভাবে সেলাই করা হয়েছে, যেমন: জামা (কামিজ)। অনুরূপভাবে শরীরের কোনো নির্দিষ্ট অংশের জন্য তৈরি পোশাকও পরা নিষিদ্ধ, যেমন: গেন্জি বা অন্তর্বাস, পায়জামা, মোজা বা জুতা ইত্যাদি। তবে যদি কেউ ইহরামের জন্য নির্ধারিত ইযার না পায়, তাহলে সে পায়জামা পরতে পারবে। একইভাবে, যদি কেউ স্যান্ডেল না পায়, তাহলে সে মোজা পরতে পারবে, কাটার প্রয়োজন নেই। কারণ, সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে উল্লেখিত ইবনু আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহুমার হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسِ خُفَّيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا، فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ».

"যে জুতা পেল না, সে যেন মোজা পরিধান করে নেয় আর যে ব্যক্তি ইযার পেল না, সে যেন পায়জামা পরে নেয়।"[1]

আর ইবনু উমার রদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসে পরিধানের প্রয়োজন হলে মোজা কাটার যে কথা বর্ণিত হয়েছে, তা মানসূখ

[1] সহীহ বুখারী (নং: ১৮৪১), সহীহ মুসলিম (নং: ১১৭৯)।

হয়ে গেছে। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনাতে এ ব্যাপারে আদেশ করেছিলেন, যখন তাকে মুহরিম ব্যক্তির পরিধেয় কাপড় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, কিন্তু পরে যখন তিনি আরাফার দিনে খুতবা দিলেন, তখন তিনি স্যান্ডেল বা জুতা না পেলে মোজা পরার অনুমতি দিলেও তা কেটে ফেলার কথা বলেননি। আর আরাফার খুতবার সময় সেখানে এমন অনেক সাহাবী উপস্থিত ছিলেন, যারা মদিনার প্রথম নির্দেশনা শোনেননি। ইসলামী শরী'আতে প্রয়োজনের মুহূর্তে কোনো বিধান স্পষ্ট করা থেকে বিলম্ব করা বৈধ নয়। এটি হাদীস ও ফিকহ শাস্ত্রের একটি মূলনীতি। সুতরাং, এটি স্পষ্ট হয় যে, মোজা কাটার পূর্বের নির্দেশটি বাতিল হয়েছে। আর যদি এটি এখনও তা বাধ্যতামূলক থাকত, তবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশ্যই তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করতেন। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মুহরিম ব্যক্তির জন্য এমন মোজা পরা জায়িয, যার উচ্চতা গোড়ালির নিচ পর্যন্ত, কারণ এগুলো স্যান্ডেল বা জুতার পর্যায়ভুক্ত।

মুহরিমের জন্য ইযার কোমরে বেঁধে রাখা বা দড়ি বা অন্য কিছু দিয়ে আটকে রাখা বৈধ, কারণ এ বিষয়ে নিষেধাজ্ঞার কোনো প্রমাণ নেই।

মুহরিমের জন্য গোসল করা, মাথা ধোয়া এবং প্রয়োজনে

সতর্কতার সঙ্গে চুল চুলকানো বৈধ। যদি এতে অসাবধানতাবশত মাথার কিছু চুল পড়ে যায়, তবে তার জন্য কোনো গুনাহ বা জরিমানা নেই।

এবং মহিলার জন্য ইহরাম অবস্থায় চেহারায় সেলাই করা কাপড় পরা নিষিদ্ধ, যেমন: বোরকা বা নিকাব, এবং হাতে সেলাই করা কাপড় পরাও নিষিদ্ধ, যেমন: হাতমোজা। এর দলীল হচ্ছে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী:

«وَلَا تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ، وَلَا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ».

"কোনো মুহরিম মহিলা নিকাব পরিধান করবে না এবং হাতমোজাও পরবে না।"[1] সহীহ বুখারী । হাতমোজা (القفازان): এমন বস্তু, যা উল, সুতির কাপড় বা অন্য কোন উপাদান দিয়ে সেলাই বা বোনা হয় এবং হাতে ফিট করার জন্য তৈরি করা হয়।

মহিলার জন্য ইহরাম অবস্থায় নিকাব ও হাতমোজা ছাড়া অন্যান্য সেলাই করা পোশাক পরা বৈধ, যেমন—কামিজ, পায়জামা, মোজা বা জুতা ইত্যাদি।

এছাড়াও যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে মহিলার জন্য বিনা বাঁধনে মাথার ওপর থেকে মুখের ওপরে ওড়না (খিমার) ঝুলিয়ে রাখা বৈধ। যদি ওড়না তার মুখের সাথে লেগে যায়, তাতেও কোনো সমস্যা নেই। এর দলীল হল: আয়েশা রদিয়াল্লাহু আনহা থেকে

---

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস (১৮৩৮)।

বর্ণিত হাদীস, যেখানে তিনি বলেছেন: "যখন আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ইহরাম অবস্থায় ছিলাম, তখন পথচারীরা আমাদেরকে অতিক্রমকালে আমরা আমাদের ওড়না (জিলবাব) মাথা থেকে মুখে নামিয়ে দিতাম, এবং যখন তারা আমাদের পাশ কাটিয়ে যেত, তখন আমরা মুখ খুলে ফেলতাম।"[1] এটি আবু দাউদ, ইবন মাযাহ বর্ণনা করেছেন, এবং দারাকুতনী উম্মু সালমা রদিয়াল্লাহু আনহা থেকেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

এছাড়া, তার জামা বা অন্য কিছু দিয়ে হাত ঢেকে রাখা কোনো সমস্যা নয়। তবে তার জন্য এটি আবশ্যক যে, তিনি তার মুখ এবং হাত ঢেকে রাখবেন যদি তিনি অন্য পুরুষদের সামনে থাকেন; কারণ এটি পর্দার হুকুমের মধ্যে শামিল, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿...وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ...﴾

আর তারা যেন তাদের স্বামী ছাড়া কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে [আন-নূর: ৩১] এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, মুখমণ্ডল ও দু'হাত নারীর সৌন্দর্যের অন্যতম বিশেষ অংশ।

আর মুখমণ্ডলের ক্ষেত্রে বিষয়টি আরও গুরুত্বপূর্ণ ও গুরুতর। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

---

[1] আবূ দাউদ, হাদীস নং (১৮৩৩)।

﴿...وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ...﴾

তোমরা তার পত্নীদের কাছ থেকে কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এ বিধান তোমাদের ও তাদের হৃদয়ের জন্য বেশী পবিত্র। [সূরা আল-আহযাব: ৫৩]

অনেক নারীর যে অভ্যাস, অর্থাৎ মাথার কাপড়ের নিচে একটি বন্ধনী রাখা যাতে তা মুখ থেকে কিছুটা উপরে থাকে—এটির কোনো শরীয়তসম্মত ভিত্তি নেই, যতদূর আমাদের জানা আছে। যদি এটি শরীয়তে বৈধ হতো, তাহলে অবশ্যই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মাতকে তা ব্যাখ্যা করতেন এবং এ বিষয়ে চুপ থাকা তার জন্য বৈধ হত না।

পুরুষ-মহিলা উভয়ের জন্য যারা ইহরাম বেঁধেছেন, তাদের জন্য তাদের ইহরামের পোশাক ময়লা বা অন্য কারণে ধোয়া জায়িয। এছাড়া তারা চাইলে তা অন্য পোশাক দিয়ে পরিবর্তনও করতে পারেন।

এবং তাদের জন্য এমন কোনো পোশাক পরিধান করা জায়িয নয়, যা জাফরান বা ওয়ারস দ্বারা রাঙানো হয়েছে; কারণ ইবনু উমর রদিয়াল্লাহু আনহুম থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ থেকে নিষেধ করেছেন।

ইহরাম অবস্থায় ব্যক্তির জন্য উচিত, সে সব ধরনের অশ্লীলতা,

পাপ, এবং তর্ক-বিতর্ক পরিহার করবে। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ...﴾

হজ হয় সুবিদিত মাসগুলোতে। তারপর যে কেউ এ মাসগুলোতে হজ করা স্থির করে সে হজের সময় স্ত্রী-সম্ভোগ, অন্যায় আচরণ, ও কলহ-বিবাদ করবে না... [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৯৭]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সহীহ সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন:

«مَنْ حَجَّ، فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ».

"যে ব্যক্তি হজ পালন করল এবং (তাতে) কোনো অশ্লীল কাজ করল না ও পাপাচার করল না, সে ব্যক্তি ঠিক ঐ দিনকার মত (নিষ্পাপ হয়ে) বাড়ি ফিরবে, যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছিল।"[1] এবং "রফাছ" শব্দের অর্থ: বলতে যৌন সম্পর্ক, অশ্লীল কথা ও কাজকে বুঝানো হয়, "ফুসূক" বলতে পাপ কাজগুলো বোঝানো হয়, এবং "জিদাল" বলতে মিথ্যা বিষয়ের উপর তর্ক-বিতর্ক বা অপ্রয়োজনীয় ঝগড়া বোঝানো হয়। তবে,

---

[1] সহীহ বুখারী, আবু হুরাইরা রদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে (নং: ১৫২১), মুসলিম (নং: ১৩৫০)।

যদি সত্য প্রমাণের জন্য বা মিথ্যাকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে আলোচনা বা বিতর্ক করা হয়, তাহলে তাতে কোনো অসুবিধা নেই; বরং এটি আদিষ্ট বিষয়; যেহেতু আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ...﴾

আপনি মানুষকে দা'ওয়াত দিন আপনার রবের পথে হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে তর্ক করবেন উত্তম পন্থায়... [সূরা আন-নাহাল: ১২৫].

এবং পুরুষ মুহরিম ব্যক্তির জন্য মাথায় লেগে থাকে এমন কিছু দিয়ে মাথা ঢেকে রাখা নিষেধ, যেমন: টুপি, রুমাল, পাগড়ী বা এরকম কিছু। তেমনিভাবে মুখও ঢেকে রাখা নিষেধ। এর প্রমাণ হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই ব্যক্তির সম্পর্কে বলেছেন, যে আরাফার দিনে নিজের বাহন থেকে পড়ে গিয়ে মারা যায়:

«اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، وَلَا وَجْهَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا».

“তাকে তোমরা পানি ও বরই পাতা দিয়ে গোসল করাও এবং তাকে তার দুটি কাপড়ে কাফন দাও, আর তার চেহারা ও মাথা ঢেকে দিও না; কেননা সে কিয়ামাতের দিনে তালবিয়া পাঠ করতে

করতে উত্থিত হবে।”[1] সহীহ বুখারী ও মুসলিম, এটি সহীহ মুসলিমের শব্দ।

আর গাড়ির ছাদ, ছাতা বা অনুরূপ কিছু দিয়ে ছায়া গ্রহণ করাতে কোনো সমস্যা নেই, যেমন: তাঁবু বা গাছের ছায়া গ্রহণ করা। সহীহ হাদীসে এসেছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একটি কাপড় দিয়ে ছায়া দেওয়া হয়েছিল যখন তিনি জামরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করেছিলেন। আর সহীহ সূত্রে এটাও প্রমাণিত যে, তিনি নামিরায় একটি তাঁবু খাটিয়েছিলেন এবং আরাফার দিনে সূর্য ঢলে পড়া পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেছিলেন।

আর পুরুষ ও নারীদের জন্য ইহরাম বাঁধা অবস্থায় স্থলজ প্রাণী শিকার করা, শিকারে সহযোগিতা করা, তাদের স্থান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া, বিবাহ বন্ধন, সহবাস, নারীদেরকে বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া এবং কামনার সঙ্গে তাদের স্পর্শ করা হারাম। উসমান রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

«لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ».

“মুহরিম ব্যক্তি বিবাহ করবে না, কাউকে বিবাহ দেবে না

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস (১৫২১), সহীহ মুসলিম, হাদীস (১৩৫০)।

এবং বিবাহের প্রস্তাবও দেবে না।”, সহীহ মুসলিম।[1] এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

যদি মুহরিম ব্যক্তি ভুলবশত বা অজ্ঞতাবশত সেলাই করা পোশাক পরে ফেলে, মাথা ঢেকে ফেলে, সুগন্ধি ব্যবহার করে, তবে তার ওপর কোনো ফিদয়া (জরিমানা) নেই। তবে যখনই তা স্মরণে আসবে বা জানতে পারবে, তখনই তা সরিয়ে ফেলতে হবে। একইভাবে যদি কেউ ভুলক্রমে বা অজ্ঞতাবশত মাথার চুল কেটে ফেলে, চুল থেকে কিছু অংশ ছেঁটে ফেলে বা নখ কেটে ফেলে, তবে বিশুদ্ধ মতানুসারে তার ওপর কোনো কিছু (জরিমানা) আবশ্যক হবে না।

একজন মুসলিমের জন্য -সে মুহরিম হোক বা না হোক, পুরুষ হোক বা নারী - হারাম এলাকার শিকার হত্যা করা এবং তা হত্যায় অস্ত্র বা ইঙ্গিতের মাধ্যমে সহায়তা করা হারাম।

এছাড়াও হারাম এলাকার শিকারকে তার জায়গা থেকে তাড়ানোও হারাম। একইভাবে হারাম অঞ্চলের গাছপালা কাটা এবং সবুজ উদ্ভিদ নষ্ট করাও নিষিদ্ধ। আর হারাম এলাকার কোনো জিনিস কুড়িয়ে নিতে চাইলে শুধুমাত্র সেই ব্যক্তি নিতে পারবে যে তা ফেরত দেয়ার উদ্দেশ্যে প্রচার করবে; কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

---

[1] সহীহ মুসলিম, হাদীস (১৪০৯)।

«فَإِنَّ هَذَا البَلَدَ - يَعْنِي مَكَّةَ - حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ، وَلَا يُلْتَقَطُ لُقَطَتُهُ إِلَّا مَنْ عَرَفَهَا، وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا».

“নিশ্চয় এ শহর -তথা মক্কা- কিয়ামাত পর্যন্ত আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশের কারণে হারাম (পবিত্র), এর কাঁটা উপড়ানো, শিকারকে তাড়ানো অথবা হারিয়ে যাওয়া কোনো বস্তু কুড়িয়ে নেওয়া যাবে না, তবে সে ব্যক্তি উঠাতে পারবে, যে তা ঘোষণা করবে। এবং এর সবুজ ঘাস কাটা যাবে না।" (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)[1] মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি।

“মুনশিদ” শব্দের অর্থ: ঘোষণাকারী, “খলা” অর্থ: সবুজ ঘাস। আর মিনা ও মুযদালিফা হারামের অন্তর্ভুক্ত, তবে আরাফাহ হারাম থেকে বাইরে।

অধ্যায়

হাজী মক্কায় প্রবেশের পর যা করবেন এবং মসজিদুল হারামে প্রবেশের পর তাওয়াফ ও তার পদ্ধতি সম্পর্কে বিবরণ।

যখন মুহরিম ব্যক্তি মক্কায় পৌঁছবে, তখন তার জন্য মক্কায় প্রবেশের আগে গোসল করা মুস্তাহাব; কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কাজ করেছিলেন।

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস (১৮৩৪), সহীহ মুসলিম, হাদীস (১৩৫৩)।

যখন সে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে, তখন সুন্নাহ হচ্ছে যে, সে তার ডান পা আগে রাখবে এবং বলবে:

"বিসমিল্লাহ, ওয়াস্-সালাতু ওয়াস্-সালামু ‘আলা রাসূলিল্লাহ। আউযু বিল্লাহিল ‘আযীম, ওয়া বিওয়াজিহিহিল কারীম, ওয়া সুলত্বানিহিল কাদীম, মিনাশ শায়ত্বানির রাজীম। আল্লাহুম্মাফতাহ্ লী আবওয়াবা রাহমাতিক।" এ দু‘আ অন্যান্য মসজিদে প্রবেশের সময়ও বলা সুন্নত। তবে মসজিদুল হারামে প্রবেশের জন্য কোনো নির্দিষ্ট দু‘আ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে প্রমাণিত আছে বলে আমার জানা নেই।

যখন সে কাবা ঘরের কাছে পৌঁছাবে, তখন সে যদি তামাত্তু হজ পালনকারী বা শুধু উমরাহ পালনকারী হয়, তবে তাওয়াফ শুরুর আগে তালবিয়া পড়া বন্ধ করবে। এরপর সে হাজারে আসওয়াদের দিকে যাবে, তার সামনে দাঁড়াবে এবং ডান হাত দিয়ে স্পর্শ করবে। যদি সম্ভব হয় চুম্বন করবে, তবে এতে অন্যদের কষ্ট না দেওয়াই উত্তম। হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করার সময় সে বলবে: "বিসমিল্লাহ, আল্লাহু আকবার” অথবা শুধু "আল্লাহু আকবার" বলবে। যদি হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করা কঠিন হয়ে যায়, তাহলে হাত বা কোনো লাঠি বা অন্য কিছু দিয়ে স্পর্শ করবে এবং যে বস্তু দিয়ে স্পর্শ করেছে, সেটিকে চুম্বন করবে। যদি স্পর্শ করাও সম্ভব না হয়, তাহলে সে শুধু ইশারা

করবে এবং "আল্লাহু আকবার" বলবে, তবে ইশারার জন্য ব্যবহৃত বস্তুকে চুম্বন করা যাবে না। তাওয়াফের বিশুদ্ধতার জন্য শর্ত হলো: তাওয়াফকারীকে ছোট বা বড় যে কোনো ধরণের অপবিত্রতা থেকে পবিত্র থাকতে হবে; কারণ তাওয়াফ সালাতের মতো, তবে পার্থক্য হচ্ছে, এতে কথা বলার অনুমতি রয়েছে। আর তাওয়াফ করার সময় কাবা শরিফকে বাম পাশে রাখতে হবে। তাওয়াফ শুরুর আগে যদি কেউ বলে: যার অর্থ: “হে আল্লাহ! তোমার প্রতি ঈমান আনয়ন করে, তোমার কিতাবকে সত্য মনে করে, তোমার প্রতিশ্রুতি পূরণ করে এবং তোমার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ অনুসরণ করে”, তাহলে তা উত্তম; কারণ, এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে।

তাওয়াফ সাত চক্করে সম্পন্ন করতে হবে। যখন কেউ মক্কায় প্রথমবার প্রবেশ করে এবং তাওয়াফ শুরু করে, তখন প্রথম তিন চক্করে রমল (দ্রুত পদক্ষেপে হাঁটা) করা সুন্নাহ। এটি উমরাহ পালনকারী, তামাত্তু হজ আদায়কারী, শুধু হজ পালনকারী এবং হজ ও উমরাহ একসঙ্গে পালনকারী সবার জন্য প্রযোজ্য। বাকী চার চক্করে স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে হবে। প্রত্যেক চক্কর হাজারে আসওয়াদ থেকে শুরু করতে হবে এবং সেখানেই শেষ করতে হবে।

রমল: কাছাকাছি পা ফেলে দ্রুত হেঁটে চলা। এ তাওয়াফের সময়ে পুরো চক্করে ইযতিবা করা মুস্তাহাব। ইযতিবা হলো: চাদরের মধ্যভাগ ডান কাঁধের নিচ থেকে চাদরের দু'প্রান্ত মুহরিমের বাম কাঁধের উপরে ঝুলিয়ে দেওয়া।

আর যদি চক্করের সংখ্যা নিয়ে কোন সন্দেহ দেখা দেয়, তাহলে নিশ্চিত তথা কম সংখ্যার উপরে ভিত্তি করে আমল করতে হবে। সুতরাং যদি মনে হয় যে, তিনটি নাকি চারটি চক্কর হল? তাহলে সে তিন ধরে নিবে। অনুরূপভাবে সায়ীর ক্ষেত্রে এমন করবে।

তাওয়াফ শেষ করার পর, মুহরিম ব্যক্তিকে তার চাদর (রিদা) কাঁধের উপর সঠিকভাবে পরিধান করতে হবে, যাতে তার দুই প্রান্ত বুকের উপরে থাকে। এরপর সে তাওয়াফের দুই রাকাত সালাত আদায় করবে।

এমন কিছু বিষয় রয়েছে যা নারীদের ক্ষেত্রে নিন্দনীয় এবং তাদেরকে সতর্ক করা উচিত, যেমন: তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ করে, সুগন্ধি ব্যবহার করে বা যথাযথ পর্দা ছাড়া তাওয়াফ করা। নারী সম্পূর্ণরূপে পর্দার অধীন, তাই তাদের জন্য অবশ্যই নিজেকে ঢেকে রাখা এবং সাজসজ্জা পরিহার করা জরুরী, বিশেষ করে এমন পরিস্থিতিতে যেখানে পুরুষদের সঙ্গে মিশতে হয়, সেটা তাওয়াফের সময়ে হোক অথবা অন্য সময়ে; কেননা, তারা পর্দার বিষয়, এবং ফিতনার (পরীক্ষা) কারণ হতে পারে। নারীর মুখ

তার সৌন্দর্যের অন্যতম প্রকাশ, যা সে তার মাহরামদের (যাদের সাথে বিবাহ হারাম) ব্যতীত অন্য কারো সামনে প্রকাশ করতে পারে না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿...وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ...﴾

আর তারা যেন তাদের স্বামী ছাড়া কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে [আন-নূর: ৩১]। অতএব যদি মহিলারা হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করতে চায় এবং সেখানে অন্য পুরুষরা তাদের দেখতে পারে তাহলে তাদেরকে জন্য মুখ খোলা রাখা জায়িয নয়। আর যদি তারা সেটি স্পর্শ বা চুম্বন করার জন্য সুযোগ না পায়, তবুও তাদের পুরুষদের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি করা বৈধ নয়। বরং তারা পুরুষদের পেছন থেকে তাওয়াফ করবে। এটি কাবার কাছাকাছি গিয়ে পুরুষদের সঙ্গে ভিড় করার চেয়ে তাদের জন্য আরও উত্তম এবং অধিক সওয়াবের কারণ হবে। এছাড়াও রমল (তাওয়াফের সময় দ্রুত গতিতে ছোট ছোট পদক্ষেপে হাঁটা) এবং ইযতিবা’ শুধুমাত্র প্রথম তাওয়াফের জন্য নির্ধারিত, যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন করেছিলেন যখন তিনি মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন । এটি অন্যান্য তাওয়াফ এবং নারীদের জন্য প্রযোজ্য নয়। তাওয়াফের সময় পবিত্র থাকা আবশ্যক, এবং তা হতে হবে বিনম্রতা ও আল্লাহর প্রতি পূর্ণাঙ্গ আনুগত্যের সঙ্গে।

তাওয়াফের সময় আল্লাহর যিকির ও দু‘আ বেশী বেশী করা মুস্তাহাব। আর যদি কেউ তাওয়াফের মধ্যে কুরআন থেকে কিছু তিলাওয়াত করে, তা ভাল। এই তাওয়াফে বা অন্য কোনো তাওয়াফে এবং সায়ীতে নির্দিষ্ট কোনো যিকির বা দু‘আ নেই।

আর কিছু লোক যে প্রতিটি তাওয়াফ বা সায়ীর প্রতিটি চক্করের জন্য নির্দিষ্ট যিকির বা দু‘আ নির্ধারণ করেছে, এর কোনো ভিত্তি নেই। বরং যা সহজভাবে যিকির ও দু‘আ করা যায়, তাই যথেষ্ট। যখন কেউ রুকনে ইয়ামানীর সম্মুখীন হয়, তখন সেটিকে ডান হাতে স্পর্শ করবে এবং বলবে: "বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার" তবে চুম্বন করবে না। যদি স্পর্শ করা কঠিন হয়, তবে তা পরিহার করে তাওয়াফ চালিয়ে যাবে এবং এ অবস্থায় রুকনে ইয়ামানীর সোজাসোজি হয়ে সেটির দিকে ইশারা করবে না বা তাকবীরও দেবে না। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এর কোনো প্রমাণ নেই। আর রুকনে ইয়ামানী ও হাজারে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থানে এই দু‘আ পড়া মুস্তাহাব:

﴿...رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ٢٠١﴾

হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দিন এবং আখেরাতেও কল্যাণ দিন এবং আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন। [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২০১] যখনই হাজারে আসওয়াদের সামনে পৌঁছাবে, তখন সেটিকে স্পর্শ করবে এবং

চুম্বন করবে, আর বলবে: "আল্লাহু আকবার"। যদি স্পর্শ ও চুম্বন করা সম্ভব না হয়, তাহলে যখনই তার বরাবর হবে, তখন তার দিকে ইশারা ও তাকবীর বলবে।

যমযম ও মাকামে ইবরাহীমের পেছন দিয়ে তাওয়াফ করাতে কোনো সমস্যা নেই, বিশেষ করে যখন ভিড় থাকে। মসজিদের পুরো চত্বরই তাওয়াফের জন্য, এমনকি কেউ যদি মসজিদের বারান্দাগুলোতেও তাওয়াফ করে, তাহলেও তা যথেষ্ট হবে। তবে যদি সহজ হয়, তাহলে কাবার কাছাকাছি তাওয়াফ করাই উত্তম।

যখন তাওয়াফ শেষ করবে, তখন মাকামের (ইবরাহিমের) পেছনে দুই রাকাত সালাত আদায় করবে, যদি তা সহজ হয়। আর যদি ভীড় ইত্যাদির কারণে সম্ভব না হয়, তাহলে মসজিদের যে কোনো স্থানে তা আদায় করবে। এই দুই রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সুন্নত হলো

﴿قُلۡ يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡكَٰفِرُونَ ۝١﴾

"বলুন, 'হে কাফিররা!" [সূরা আল-কাফিরূন, আয়াত: ১] প্রথম রাকাতে, আর

﴿قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ۝١﴾

বলুন, 'তিনি আল্লাহ্, এক-অদ্বিতীয়,' [আল-ইখলাস: ১] দ্বিতীয় রাকাতে। এটা উত্তম, তবে যদি অন্য কোন সূরা দিয়ে পড়ে, তবে তাতেও কোনো সমস্যা নেই। এরপরে সে হাজরে

আসওয়াদের দিকে যাবে, ডান হাতে তা স্পর্শ করবে যদি সম্ভব হয়, আর এটি করবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণের জন্য।

তারপর সে সাফা পাহাড়ের দিকে সাফার দরজা দিয়ে বের হবে, , এবং সেখানে উঠবে বা অন্তত অবস্থান করবে। যদি সহজ হয়, তাহলে সফায় ওঠা উত্তম। তারপর প্রথম চক্করের শুরুতে আল্লাহর এ বাণী (আয়াতটি) পড়বে:

“নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত।”

﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ...﴾

নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত... [আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৫৮]

সাফায় পৌঁছে কিবলামুখী হওয়া মুস্তাহাব। এরপর আল্লাহর প্রশংসা ও তাকবীর বলা, এবং নিম্নোক্ত দু‘আ পড়া উত্তম: যার অর্থ: “আল্লাহ ছাড়া কোনো প্রকৃত ইলাহ নেই, এবং আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ ছাড়া কোনো প্রকৃত ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। সার্বভৌমত্ব ও সমস্ত প্রশংসা কেবল তাঁরই জন্য। তিনিই জীবন দেন আর তিনিই মৃত্যু দেন, এবং তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ ছাড়া কোনো প্রকৃত ইলাহ নেই, তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছেন, তাঁর বান্দাকে

সাহায্য করেছেন, এবং একাই সমস্ত শত্রু দলকে পরাজিত করেছেন।” তারপর হাত উঁচু করে যা সহজসাধ্য দু‘আ করবে। আর এই যিকর ও দু‘আ তিনবার পুনরাবৃত্তি করবে। এরপর সে মারওয়ার দিকে চলতে থাকবে, প্রথম চিহ্নিত স্থানে পৌঁছালে পুরুষ দ্রুত চলবে এবং দ্বিতীয় চিহ্নিত স্থানে পৌঁছা পর্যন্ত দ্রুত চলতে থাকবে। তবে নারীদের জন্য এই দুই চিহ্নিত স্থানের মাঝে দ্রুত চলা শরী‘আতসম্মত নয়; কারণ তারা পর্দার অন্তর্ভুক্ত। তাদের জন্য সম্পূর্ণ সায়ী স্বাভাবিক হেঁটে আদায় করাই শরী‘আতসম্মত। এরপর সে মারওয়ার দিকে আরো এগিয়ে গিয়ে সেখানে আরোহন করবে অথবা সেখানে দাঁড়াবে। সম্ভব হলে সেখানে আরোহণ করা উত্তম। সে মারওয়াতে সেই কথা ও কাজগুলো বলবে ও করবে, যা সে সাফাতে বলেছে ও করেছে। তবে উক্ত আয়াতটি পাঠ করবে না, তথা আল্লাহর বাণী:

﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ...﴾

নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত... [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৫৮] এটি কেবলমাত্র প্রথম চক্করে সাফায় আরোহণ করার সময়ই শরী‘আতসম্মত; কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণে এটি করা হয়। এরপর সে নেমে যাবে এবং যেখানে ধীরে চলার জায়গা সেখানে ধীরে চলবে, আর যেখানে দ্রুত চলার জায়গা সেখানে দ্রুত চলবে,

যতক্ষণ না (পুনরায়) সাফায় পৌঁছে। এভাবে সে সাতবার করবে; তার যাওয়া একটি চক্কর এবং ফিরে আসা আরেকটি চক্কর হিসেবে গণ্য হবে। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবেই করেছেন এবং তিনি বলেছেন:

«خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ».

"তোমরা আমার কাছ থেকে হজের আহকাম গ্রহণ কর।"[1]

সায়ী করার সময় বেশি করে যিকির ও দু'আ করা মুস্তাহাব। যা সহজ হয়, তা-ই পড়বে। এছাড়া, ছোট বা বড় নাপাকী থেকে পবিত্র থাকা উত্তম। তবে কেউ যদি অপবিত্র অবস্থায় সায়ী করে, তাহলেও তা সহীহ হয়ে যাবে। একইভাবে, কোনো নারী যদি তাওয়াফের পর হায়েযগ্রস্ত হয় বা নিফাসে আক্রান্ত হয়, তাহলেও সে সায়ী করতে পারবে এবং তা যথেষ্ট হবে। কারণ, সায়ীর জন্য পবিত্রতা (ওযু বা গোসল) শর্ত নয়; বরং এটি মুস্তাহাব, যেমন পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

যখন সায়ী সম্পন্ন হবে, তখন মাথার চুল মুন্ডানো (হালক) বা ছোট করা (কাসর) আবশ্যক। পুরুষদের জন্য চুল মুন্ডানো উত্তম, তবে কেউ যদি ছোট করে রেখে দেয় হজের সময় মুন্ডানোর জন্য, তাহলে সেটিও ভালো। আর যদি কেউ হজের সময়ের কাছাকাছি মক্কায় পৌঁছান, তাহলে তার জন্য চুল ছোট করা উত্তম, যেন

[1] প্রাগুক্ত।

হজের সময় তিনি পুরো মাথা মুন্ডাতে পারেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ৪ঠা জিলহজ মক্কায় এলেন এবং তার সাহাবীগণও সাথে ছিলেন, তখন তিনি যাদের সাথে কুরবানির পশু ছিল না, তাদের ইহরাম খুলে ফেলতে এবং চুল ছোট করতে বললেন, কিন্তু মুন্ডানোর নির্দেশ দেননি। তবে চুল ছোট করার ক্ষেত্রে পুরো মাথা থেকে চুল কাটা আবশ্যক; শুধু কিছু অংশ কাটলেই হবে না। ঠিক তেমনি, মাথার কিছু অংশ মুন্ডালে তা যথেষ্ট হবে না।

নারীদের জন্য চুল মুন্ডানো বৈধ নয়, বরং তাদের জন্য কেবল চুল ছোট করা শরী'আতসম্মত। এ ক্ষেত্রে প্রত্যেক বেণী থেকে এক আঙুলের মাথা পরিমাণ চুল কাটবে। মহিলারা এর চেয়ে বেশি কাটবে না।

যখন মুহরিম ব্যক্তি উপরোক্ত কাজগুলি সম্পন্ন করবে, তখন তার উমরাহ সম্পন্ন হবে এবং ইহরাম অবস্থায় তার উপরে যা হারাম ছিল, সেগুলি তার জন্য পুনরায় হালাল হয়ে যাবে। তবে যদি হালাল অবস্থায় কেউ কুরবানীর পশু সাথে নিয়ে যায়, তবে সে ইহরাম অবস্থায় থাকবে, যতক্ষণ না হজ ও উমরাহ উভয়টি থেকে সে হালাল হয়।

আর যে ব্যক্তি শুধু হজের জন্য ইহরাম বেঁধেছে (মুফরিদ) বা একসঙ্গে হজ ও উমরাহর জন্য একসাথে ইহরাম বেঁধেছে

(ক্বারিন), তার জন্য সুন্নত হলো ইহরামের অবস্থাকে পরিবর্তন করে শুধু উমরাহর জন্য নির্দিষ্ট করা এবং তামাত্তু পালনকারীর মতো সব আমল সম্পন্ন করা—যদি না সে কুরবানির পশু সঙ্গে নিয়ে এসে থাকে। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাহাবীদের এ কাজ করতে আদেশ দিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন:

«لَوْلَا أَنِّي سُقْتُ الهَدْيَ لَأَحْلَلْتُ مَعَكُمْ».

"যদি না আমি হাদী (কুরবানীর পশু) নিয়ে আসতাম, তাহলে তোমাদের সাথে হালাল হয়ে যেতাম।"[1]

আর যদি কোনো নারী ইহরাম বাঁধার পর হায়িয অথবা নিফাসগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তাহলে সে কাবায় তাওয়াফ করবে না এবং সাফা-মারওয়ার মধ্যে সায়ীও করবে না যতক্ষণ না সে পবিত্র হয়। এরপর যখন সে পবিত্র হবে, তখন সে তাওয়াফ করবে, সায়ী করবে এবং চুলের কিছু অংশ কেটে ফেলবে; এভাবেই তার উমরাহ সম্পূর্ণ হবে। কিন্তু যদি সে ইয়াওমুত তারবিয়া (৮ই যিলহজ) পর্যন্ত পবিত্র না হয়, তাহলে সে যে স্থানে অবস্থান করছে সেখান থেকেই হজের ইহরাম বাঁধবে এবং মানুষের সঙ্গে মিনা অভিমুখে বের হবে। এর ফলে তার হজ ও 'উমরাহ একত্রিত হয়ে কিরান আদায়কারী হয়ে যাবে। এরপর সে হাজীদের মতোই আরাফায় অবস্থান, মিনা ও মুযদালিফায় রাত যাপন, কঙ্কর

[1] সহীহ বুখারী (নং: ১৫৬৮)।

নিক্ষেপ, হাদী যবেহ করা (কুরবানী দেওয়া) এবং চুল কাটার কাজ সম্পন্ন করবে। অতঃপর যখন সে পবিত্র হবে, তখন কাবা তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়া সায়ী করবে, যা তার হজ ও ‘উমরাহ উভয়ের জন্য যথেষ্ট হবে।

আয়িশা রদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তিনি ইহরাম বাঁধার পর মাসিক শুরু হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছিলেন:

«افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي».

“তুমি একজন হাজীর মত সব কিছু করো, তবে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত কাবার তাওয়াফ করো না।"[1] মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি।

আর যখন হায়িয অথবা নিফাস অবস্থায় কোনো নারী ইয়াওমুন নাহর (১০ই যিলহজ)-এর দিন জামারাতে কঙ্কর নিক্ষেপ করে এবং চুল ছেঁটে ফেলবে, তখন ইহরামের কারণে তার জন্য যা কিছু নিষিদ্ধ ছিল, সেগুলো হালাল হয়ে যাবে, যেমন: সুগন্ধি ও ইত্যাদি। তবে স্বামী হালাল হবে না যতক্ষণ না অন্যান্য পবিত্র নারীদের মত সে হজ সম্পন্ন করে। এরপর যখন সে পবিত্র হয়ে তাওয়াফ ও সায়ী সম্পন্ন করবে, তখন তার জন্য স্বামীও হালাল হয়ে যাবে।

---

[1] সহীহ বুখারী (নং: ৩০৫), সহীহ মুসলিম (নং: ১২১১)।

অধ্যায়

যিলহজের ৮ তারিখে হজের ইহরাম বাঁধা ও মিনায় গমনের হুকুম সম্পর্কে।

যিলহজের অষ্টম দিন, যা ‘ইয়াওমুত তারবিয়া নামে পরিচিত, এ দিন মক্কায় হালাল হয়ে অবস্থানরত এবং হজ করতে ইচ্ছুক মক্কার অধিবাসীদের জন্য নিজ নিজ বাসস্থান থেকেই হজের ইহরাম বাঁধা মুস্তাহাব। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ রদিয়াল্লাহু আনহুম ‘আবতাহ’ নামক স্থানে অবস্থান করেছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে সেখান থেকেই হজের ইহরাম বেঁধেছিলেন। তিনি তাদেরকে কাবা ঘরে গিয়ে ইহরাম বাঁধতে বা ‘মিযাব’-এর নিকট থেকে ইহরাম বাঁধতে আদেশ করেননি। একইভাবে তিনি তাদেরকে মিনা যাওয়ার আগে বিদায়ী তাওয়াফ করতে বলেননি। যদি এটি শরী‘আতের অংশ হতো, তবে তিনি অবশ্যই তাদের এটি শিক্ষা দিতেন। প্রকৃত কল্যাণ তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে এবং তার সাহাবীদের অনুসরণ করার মধ্যেই রয়েছে।

আর মুস্তাহাব হচ্ছে হজের ইহরাম বাঁধার সময় গোসল করা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া, যেভাবে সে মীকাতের কাছ থেকে ইহরাম বাঁধার সময় করেছে। আর তারা যখন হজের জন্য ইহরাম

বাঁধবে, তখন সুন্নত হলো তারা যোহরের পূর্বে বা পরে (যে কোনো সময়) ইয়াওমুত তারবিয়ার (৮ই জিলহজ)-তে মিনার দিকে রওনা হবে এবং তারা অধিক পরিমাণে তালবিয়া পাঠ করবে, যতক্ষণ না জামারাতুল আকাবাতে কঙ্কর নিক্ষেপ করে। তারা মিনায় যোহর, আসর, মাগরিব, এশা ও ফজরের সালাত আদায় করবে। সুন্নত হলো, তারা প্রত্যেক সালাত তার নির্ধারিত সময়ে কসর সহকারে আদায় করবে, তবে মাগরিব ও ফজর কসর করা যাবে না।

এতে মক্কাবাসী ও বাইরের লোকদের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই; কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কাবাসী ও অন্যদের নিয়ে মিনায়, আরাফায় ও মুযদালিফায় কসর সহকারে সালাত আদায় করেছেন এবং মক্কাবাসীদের পূর্ণ সালাত আদায়ের নির্দেশ দেননি। যদি তাদের জন্য পূর্ণ সালাত পড়া ওয়াজিব হতো, তবে তিনি নিশ্চয়ই বিষয়টি তাদেরকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতেন।

তারপরে আরাফার দিনে সূর্যোদয়ের পর হাজীগণ মিনা থেকে আরাফার দিকে গমন করবে। সুন্নাত হচ্ছে যদি সম্ভব হয়, তাহলে তারা সূর্য ঢলে পড়া পর্যন্ত নামিরাতে অবস্থান করবে, যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনটি করেছেন।

যখন সূর্য ঢলে পড়বে, তখন সুন্নাহ হচ্ছে- ইমাম বা তার প্রতিনিধি মঞ্চে দাঁড়িয়ে একটি খুতবা দিবে যা এই দিনের জন্য

উপযোগী হবে এবং পরবর্তী সময়ের জন্যও। সে খুতবাতে হাজীদের উদ্দেশ্যে জানিয়ে দেবে যে আজকের দিনে ও পরবর্তীতে কী কী কাজ করা উচিত, আল্লাহর ভয় এবং তাওহীদের কথা স্মরণ করাবে, সমস্ত কাজের মধ্যে একনিষ্ঠতা এবং সততা বজায় রাখার কথা বলবে, আল্লাহর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে সাবধান থাকতে বলবে, তাদেরকে আল্লাহর কিতাব ও নবীর সুন্নাত অনুসরণের জন্য উৎসাহিত করবে, সব বিষয়ে আল্লাহর আইন ও তাঁর নবীর ফয়সালা মোতাবেক বিচার করার আহ্বান জানাবে। এরপর আসরের সালাত ও যোহরের সালাতকে যোহরের ওয়াক্তে এক আযান ও দুই ইকামাতের মাধ্যমে কসর করে একত্রে আদায় করবেন। কেননা এই কাজটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন। ইমাম মুসলিম জাবির রদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

তারপর হাজীরা আরাফাতে অবস্থান করবে, আর সব জায়গাই মওকেফ (অবস্থানস্থল) হবে, তবে 'বাতনে উরানাহ' নামক অংশটি বাদে। তাদের জন্য সম্ভব হলে কিবলামুখী হওয়া এবং জাবালে রহমতের দিকে মুখ করে দাঁড়ানো উত্তম। যদি তা সম্ভব না হয়, তবে কিবলার দিকে মুখ করে দাঁড়ানো এবং পাহাড়ের দিকে না তাকানোও যথেষ্ট। এই অবস্থায় হাজীর জন্য আল্লাহর যিকির, দু'আ ও অত্যন্ত বিনয়ীভাবে থাকা মুস্তাহাব, এবং সে দু'আ করলে

দুই হাত উত্তোলন করে দু'আ করবে। তদুপরি যদি 'লাব্বাইক' পাঠ করা বা কুরআন থেকে কিছু পাঠ করা হয়, তা হলে সেটিও ভালো। এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি যা বলা উচিত তা হলো: (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লাশারিকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু, ইয়ুহয়ি

ওয়া ইউমিতু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর) "আল্লাহ ব্যতীত কোন প্রকৃত ইলাহ নেই, তিনি একক, যার কোন শরীক নেই, মালিকানা ও প্রশংসা তাঁরই, তিনি জীবন দেন, তিনিই মৃত্যু দেন, আর তিনি সকল কিছুর উপরে শক্তিমান।" কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এটি বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন:

«خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ».

"সর্বোত্তম দু'আ হচ্ছে আরাফার দিনের দু'আ। আর সর্বোত্তম কথা যা আমি ও আমার পূর্বের নবীগণ করেছেন, তা হচ্ছে: "আল্লাহ ব্যতীত কোন প্রকৃত ইলাহ নেই, তিনি একক, যার কোন শরীক নেই, মালিকানা ও প্রশংসা তাঁরই, তিনি জীবন দেন, তিনিই মৃত্যু দেন, আর তিনি সকল কিছুর উপরে শক্তিমান।"[1] বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

[1] তিরমিযী, হাদীস নং (৩৫৮৫)।

বলেছেন:

«أَحَبُّ الكَلَامِ إِلَى اللهِ أَرْبَعٌ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالحَمْدُ لِلهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ».

“আল্লাহর নিকটে সবচেয়ে প্রিয় কথা চারটি: সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং আল্লাহু আকবার।”[1]

সুতরাং একগ্রতা ও মনোযোগের সাথে এই যিকরটি অধিক পরিমাণে করা উচিত। একইভাবে শরী‘আতসম্মত অন্যান্য যিকর ও দু‘আগুলোও প্রতিটি সময়ে অধিক পরিমাণে করা উচিত, বিশেষত এই মহান দিনে ও এই স্থানে। এর মধ্যে বহু অর্থবোধক যিকর ও দু‘আ বাছাই করে পড়বে, যার মধ্যে রয়েছে:

"‘সুবহানাল্লাহ্ ওয়া বিহামদিহী, সুবহানাল্লাহিল আযীম’', অর্থ:

"আমি আল্লাহ্ তা’আলার প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করছি, মহান আল্লাহ্ অতীব পবিত্র।"

﴿...لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ٨٧﴾

আপনি ব্যতীত কোনো সত্য ইলাহ নেই; আপনি কতইনা পবিত্র ও মহান, নিশ্চয়ই আমি যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছি [আল-আম্বিয়া : ৮৭]

"আল্লাহ ছাড়া কোনো প্রকৃত ইলাহ নেই, আমরা কেবলমাত্র তাঁরই উপাসনা করি। তাঁর কাছেই রয়েছে অনুগ্রহ, তাঁরই কাছেই

[1] সহীহ মুসলিম, হাদীস (২১৩৭)

রয়েছে নি'আমাত আর সকল ভালো প্রশংসাও তাঁরই জন্য নির্দিষ্ট। আল্লাহ ছাড়া কোনো প্রকৃত ইলাহ নেই, আমরা তাঁর জন্যই দীনকে ইখলাস সহকারে পালন করি, যদিও কাফেররা এটি পছন্দ না করুক।"

আল্লাহর তাওফীক ব্যতীত গুনাহ হতে বাঁচার কোন সামর্থ্য নেই এবং নেক কাজ করার কোন শক্তিও নেই।[1]

* ﴿...رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝٢٠١﴾

হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দিন এবং আখেরাতেও কল্যাণ দিন এবং আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।

[সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২০১]

* اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِيَ الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِيَ الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، وَاجْعَلِ الحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَالمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ.

"হে আল্লাহ! তুমি আমার দীনকে সংশোধন করে দাও, যা আমার সকল কর্মের হিফাযতকারী। তুমি আমার দুনিয়াকে সংশোধন করে দাও, যার মধ্যে আমার জীবন-জীবিকা রয়েছে এবং তুমি আমার আখেরাতকে সংশোধন করে দাও, যেখানে

[1] মুসলিম ইবনু যুবায়ের রদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণনা করেছেন (নং: ৫৯৪)।

আমার প্রত্যাবর্তন হবে। আর তুমি প্রতিটি কল্যাণের জন্য আমার হায়াতকে বাড়িয়ে দাও এবং খারাপ বা অকল্যাণ থেকে আমার জন্য মৃত্যুকে স্বস্তিদায়ক করে দাও।"[1]

* أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ جَهْدِ البَلَاءِ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ القَضَاءِ، وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ.

"আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি, কঠিন বিপদ, দুঃখজনক পরিণতি, মন্দ ভাগ্য, এবং শত্রুদের হাস্যরস থেকে।"[2]

* اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَمِّ وَالحَزَنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ وَالكَسَلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الجُبْنِ وَالبُخْلِ، وَمِنَ المَأْثَمِ وَالمَغْرَمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ.

"হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি চিন্তা ও দুঃখ থেকে, আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি অকর্মন্যতা ও অলসতা থেকে, আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি কাপুরুষতা ও কৃপণতা থেকে, আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি পাপ ও ঋণের বোঝা থেকে, এবং আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি ঋণের চাপ ও মানুষের শাসনের শোষণ থেকে।"[3]

* اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ البَرَصِ وَالجُنُونِ وَالجُذَامِ وَمِنْ سَيِّئِ

---

[1] আবু হুরাইরা রদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে মুসলিম বর্ণনা করেছেন (নং: ২৭২০)।

[2] সহীহ বুখারী, আবু হুরাইরাহ রদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে (নং: ৬৩৪৭)।

[3] হাদীসটি এই শব্দে আবু উমামা আনসারী রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে সুনানে আবু দাউদে বর্ণিত হয়েছে, তবে "ঋণ ও পাপের বোঝা" এই অংশটি নেই, (নং: ১৫৫৪)।

الأَسْقَامِ [٦٠].

“হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি কুষ্ঠরোগ, পাগলামি, শ্বেতরোগ সহ সব ধরনের কঠিন রোগ থেকে।”[1]

* হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষমা ও সুস্থতা প্রার্থনা করি।

* "হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে আমার ধর্ম, পৃথিবী, পরিবার ও সম্পদে ক্ষমা ও সুস্থতার প্রার্থনা করি।"

* اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَتِي وَآمِنْ رَوْعَاتِي، اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي.

"হে আল্লাহ, আমার দোষ-ত্রুটিগুলি গোপন করুন এবং আমার ভয় দূরীভূত করুন। হে আল্লাহ, আমাকে আমার সামনে, পেছনে, ডান ও বাম পাশে, উপর থেকে হিফাযত রাখুন এবং আপনার মহিমা দিয়ে আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যেন আমি নীচ থেকেও আক্রান্ত না হই।"[2]

* اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي جِدِّي وَهَزْلِي، وَخَطَئِي وَعَمْدِي، وَكُلَّ ذَلِكَ عِنْدِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ المُقَدِّمُ وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

“হে আল্লাহ, আপনি আমার গুরুতর ও হালকা (গম্ভীর ও

---

[1] আবু দাউদ আনাস রদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে (নং: ১৫৫৪) বর্ণনা করেছেন।

[2] আবু দাউদ ইবনু উমার রদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণনা করেছেন (নং: ৫০৭৪)।

হাস্যরসপূর্ণ) গুনাহ, আমার ভুল ও ইচ্ছাকৃত অপরাধ—সবকিছুই ক্ষমা করে দিন। হে আল্লাহ, আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন আমার অতীত ও ভবিষ্যতের গুনাহ, যা গোপনে করেছি ও যা প্রকাশ্যে করেছি, এবং যা আপনি আমার চেয়েও ভালো জানেন। আপনিই অগ্রসরকারী, আর আপনিই পিছিয়ে দেওয়ার অধিকারী, আর আপনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।"[1]

* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الأَمْرِ وَالعَزِيمَةَ عَلَى الرُّشْدِ، وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا وَلِسَانًا صَادِقًا، وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ، إِنَّكَ عَلَّامُ الغُيُوبِ.

"হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে কাজে স্থিরতা ও সঠিক পথের দৃঢ় সংকল্প প্রার্থনা করছি। আমি আপনার নি'আমাতের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও সুন্দর ইবাদতের তাওফীক কামনা করছি। আমি আপনার কাছে একটি বিশুদ্ধ হৃদয় ও একটি সত্যবাদী জিহ্বা প্রার্থনা করছি। আমি আপনার কাছে আপনার ইলমে থাকা কল্যাণ প্রার্থনা করছি, আর আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি আপনার ইলমে থাকা অকল্যাণকর বিষয় থেকে। আর আমি ক্ষমা চাচ্ছি এমন সব বিষয়ে যা আপনি জানেন, নিশ্চয়ই আপনি অদৃশ্যের

[1] হাদীসের একটি অংশ যা ইমাম মুসলিম আবু মূসা আল-আশ'আরী রদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণনা করেছেন (নং: ২৭১৯)।

সর্বজ্ঞ।"[1]

* اللَّهُمَّ رَبَّ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، وَأَذْهِبْ غَيْظَ قَلْبِي وَأَجِرْنِي مِنْ مُضِلَّاتِ الفِتَنِ مَا أَحْيَيْتَنَا.

"হে আল্লাহ, নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রব! আপনি আমার গুনাহ ক্ষমা করুন, আমার অন্তরের ক্রোধ দূর করে দিন এবং যতদিন আমাদের জীবিত রাখবেন ততদিন আমাদের বিপথগামী ফিতনা থেকে রক্ষা করবেন।"[2]

* اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الأَرْضِ وَرَبَّ العَرْشِ العَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ البَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الفَقْرِ.

“হে আল্লাহ! (আপনি) আকাশসমূহের রব, যমীনের রব, মহান ‘আরশের রব, আমাদের রব ও প্রত্যেক বস্তুর রব। (হে) শস্য-বীজ ও আঁটি বিদীর্ণকারী, তাওরাত, ইঞ্জীল ও কুরআন নাযিলকারী, আমি আপনার নিকট এমন প্রত্যেক বস্তুর অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি, আপনি যার অগ্রভাগ (মাথা) ধরে রেখেছেন। হে আল্লাহ! আপনিই প্রথম আপনার পূর্বে কিছুই নেই, আপনি সর্বশেষ আপনার পরে কিছুই নেই, আপনি সব কিছুর উপরে আপনার উপরে কিছুই নেই; আপনি সর্বনিকটে, আপনার

[1] তিরমিযী শাদ্দাদ ইবনু আউস রদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণনা করেছেন (নং: ৩৪০৭)।

[2] উম্মু সালামাহ রদিয়াল্লাহু আনহা সূত্রে আহমাদ বর্ণনা করেছেন (৬/৩০১)।

চেয়ে নিকটবর্তী কিছু নেই, আপনি আমাদের সমস্ত ঋণ পরিশোধ করে দিন এবং আমাদেরকে অভাব থেকে মুক্ত করুন।"[1]

* اللَّهُمَّ أَعْطِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَالْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

"হে আল্লাহ, আমার আত্মাকে তাকওয়া দান করুন, এবং তাকে পরিশুদ্ধ করুন, আপনি তো সর্বোত্তম পরিশুদ্ধকারী। আপনিই তার অভিভাবক ও পালনকর্তা। হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে অক্ষমতা ও অলসতা থেকে আশ্রয় চাই। আমি আপনার কাছে কাপুরুষতা, বার্ধক্য ও কৃপণতা থেকে আশ্রয় চাই এবং আমি আপনার কাছে কবরের শাস্তি থেকেও আশ্রয় চাই।[2]

* اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ أَنْ تُضِلَّنِي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ يَمُوتُونَ.

"হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আত্মসমর্পণ করেছি, আপনার উপর ঈমান এনেছি, আপনার উপর ভরসা করেছি, আপনারই দিকে প্রত্যাবর্তন করেছি এবং আপনার জন্যই বিতর্ক করেছি। আমি আপনার মহিমার আশ্রয় চাই যেন আপনি আমাকে পথভ্রষ্ট না করেন। আপনি ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই। আপনি

[1] সহীহ মুসলিম (নং: ২৭১৩), আবু হুরাইরা রদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত।

[2] সহীহ মুসলিম, যায়েদ ইবনু আরকাম রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত (নং: ২৭২২)।

চিরঞ্জীব, যিনি কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না, আর জিন ও মানুষ সবাই মৃত্যুবরণ করবে।”[1]

* اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا.

“হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই এমন জ্ঞান থেকে যা উপকারে আসে না, এমন অন্তর থেকে যা বিনীত হয় না, এমন আত্মা থেকে যা তৃপ্ত হয় না, এবং এমন দু‘আ থেকে যা কবুল করা হয় না।”[2]

* اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي مُنْكَرَاتِ الأَخْلَاقِ وَالأَعْمَالِ وَالأَهْوَاءِ وَالأَدْوَاءِ.

“হে আল্লাহ! আপনি আমাকে দুশ্চরিত্র, অসৎ কর্ম, কু-প্রবৃত্তি ও রোগ-ব্যাধি থেকে দূরে রাখুন।”[3]

* اللَّهُمَّ أَلْهِمْنِي رُشْدِي، وَأَعِذْنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِي.

“হে আল্লাহ, আপনি আমাকে সঠিক পথ দেখান এবং আমাকে আমার নফসের অনিষ্ট থেকে হিফাযত করুন।”[4]

* اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ.

“হে আল্লাহ! আপনি আমাকে আপনার হালাল দ্বারা হারাম

---

[1] সহীহ মুসলিম, ইবনু আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত (নং: ২৭১৭)।

[2] এটি যায়েদ ইবনু আরকাম রদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণিত হাদীসের অংশ (নং: ২৭২২), এর তাখরীজ পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।

[3] তিরমিযী, যিয়াদ ইবনু আলাকাহ সূত্রে, তিনি তার চাচা থেকে বর্ণনা করেছেন (নং: ৩৫৯১)।

[4] সুনানে তিরমিযি, ইমরান ইবনু হুসাইন সূত্রে বর্ণিত (নং: ৩৪৮৩)।

থেকে বাঁচিয়ে দিন এবং আপনার অনুগ্রহের মাধ্যমে আমাকে অন্যদের মুখাপেক্ষী হওয়া থেকে মুক্ত করুন।”[1]

* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الهُدَى وَالتُّقَى وَالعَفَافَ وَالغِنَى.

“হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট হেদায়াত, তাকওয়া, অশ্লীলতা হতে পবিত্রতা এবং সচ্ছলতা প্রার্থনা করি।”[2]

* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الهُدَى وَالسَّدَادَ.

“হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট হিদায়াত ও সঠিক পথের প্রার্থনা করি।[3]

* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الخَيْرِ كُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ ﷺ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ ﷺ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْرًا.

“হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে প্রতিটি কল্যাণ প্রার্থনা করছি, তা হোক দ্রুত অথবা বিলম্বিত, যা আমি জানি এবং যা আমি জানি না। আর আমি আপনার আশ্রয় চাই সমস্ত অকল্যাণ থেকে—তা হোক দ্রুত বা বিলম্বিত, যা আমি জানি এবং যা আমি জানি না।

---

[1] আলী রদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে তিরমিযী বর্ণনা করেছেন (নং: ৩৫৬৩)।

[2] আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে মুসলিম বর্ণনা করেছেন (নং: ২৭২১)।

[3] মুসলিম, আলী রদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণনা করেছেন (নং: ২৭২৫)।

আমি আপনার নিকট সেই সমস্ত কল্যাণ প্রার্থনা করছি, যা আপনার বান্দা ও নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রার্থনা করেছিলেন এবং আমি আপনার আশ্রয় চাই সেই সমস্ত অকল্যাণ থেকে, যা থেকে আপনার বান্দা ও নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশ্রয় চেয়েছেন।

হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট জান্নাত ও জান্নাতের নৈকট্য লাভে সহায়ক সব কথা ও কাজ প্রার্থনা করছি। আর আমি আপনার আশ্রয় চাই জাহান্নাম থেকে এবং জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়ার সকল কথা ও কাজ থেকে।

হে আল্লাহ, আপনি আমার জন্য যে কোনো ফয়সালা করুন না কেন, তা আমার জন্য কল্যাণময় করে দিন।”[1]

* لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ بِيَدِهِ الخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ العَلِيِّ العَظِيمِ.

“আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই, তিনি এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো অংশীদার নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং সকল প্রশংসাও তাঁরই জন্য। তিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দেন। সকল কল্যাণ তাঁরই হাতে, আর তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।

পবিত্র মহান আল্লাহ! সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। আর মহান ও

[1] ইবনু মাজাহ, আয়িশা রদিয়াল্লাহু আনহা সূত্রে (নং: ৩৮৪৬) বর্ণনা করেছেন।

পরাক্রমশালী, আল্লাহ ছাড়া কোনো শক্তি ও সামর্থ্য নেই।”[1]

* اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

“হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদের ওপর এবং মুহাম্মাদের বংশধরদের ওপর রহমত বর্ষণ করুন, যেরূপ আপনি ইবরাহীম এবং ইবরাহীমের বংশধরদের ওপর রহমত বর্ষণ করেছেন। নিশ্চয়ই আপনি অতি প্রশংসিত, অত্যন্ত মর্যাদার অধিকারী। হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদের বংশধরদের ওপর তেমনি বরকত দান করুন যেমনি আপনি বরকত দান করেছেন ইবরাহীম এবং ইবরাহীমের বংশধরদের ওপর। নিশ্চয়ই আপনি অতি প্রশংসিত, অতি মর্যাদার অধিকারী।” ..[2]

* ﴿...رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾﴾

হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দিন এবং আখেরাতেও কল্যাণ দিন এবং আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।

[সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২০১]

---

[1] বুখারী, উবাদাহ ইবনু সামিত রদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে (নং: ১১৫৪) বর্ণনা করেছেন।

[2] বুখারী, কা‘ব ইবনু উজরাহ রদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে (নং: ৩৩৭০) বর্ণনা করেছেন।

এই মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে হাজীদের জন্য পূর্বে উল্লেখিত যিকির ও দু‘আ বারবার পড়া মুস্তাহাব। এছাড়াও অনুরূপ অন্যান্য যিকির, দু‘আ এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পাঠ করা উত্তম। হাজীদের উচিত দু‘আতে আগ্রহ ও আন্তরিকতা প্রকাশ করা, আল্লাহর কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ প্রার্থনা করা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো দু‘আ করতেন, তখন তিনবার করে তা পুনরাবৃত্তি করতেন। কাজেই তার এই সুন্নাত অনুসরণ করা সর্বোত্তম।

এই দিনে একজন মুসলিমের উচিত আল্লাহর সামনে বিনত থাকা, নিজেকে নম্র ও বিনম্র রাখা, তাঁর সম্মুখে নিজেকে আত্মসমর্পণ করা, ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে তাঁর করুণা ও ক্ষমার প্রত্যাশা করা এবং তাঁর শাস্তি ও অসন্তোষ থেকে ভয় পাওয়া। নিজের আমল নিয়ে আত্মমূল্যায়ন করা এবং আন্তরিক তওবা নবায়ন করাও একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। কারণ, এটি এক মহিমান্বিত দিন ও বিশাল সমাবেশ, যেখানে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করেন, ফেরেশতাদের সামনে তাদের নিয়ে গর্ব করেন এবং বিপুল সংখ্যক মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন। শয়তানকে এ দিনে সবচেয়ে অপদস্থ, লাঞ্ছিত ও দুর্বল দেখা যায়। বদরের দিনেই শুধুমাত্র তাকে এর চেয়েও বেশি অপমানিত ও পরাজিত হতে হয়েছিল। কারণ, সে আল্লাহর সীমাহীন অনুগ্রহ,

বান্দাদের প্রতি তাঁর দয়া ও প্রচুর মুক্তির ঘোষণা দেখে হতাশ হয়ে পড়ে।

সহীহ মুসলিমে, আয়িশা রদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

«مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ المَلَائِكَةَ، فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ؟».

"আরাফার দিন অপেক্ষা এমন কোনো দিন নেই, যেদিন আল্লাহ সর্বাধিক বেশি সংখ্যায় বান্দাকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করেন। এ দিন তিনি (বান্দার) নিকটবর্তী হন, অতপর তাদের সম্পর্কে ফিরিশতাদের নিকট গৌরব করে বলেন, তারা কী চায়?"[1]

অতএব মুসলিমদের উচিত আল্লাহর সামনে নিজেদের ভালো আমল প্রদর্শন করা, শয়তানকে অপমানিত করা এবং তাকে দুঃখিত করা তথা: অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকির, দু'আ, অনুশোচনা ও ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং সমস্ত গুনাহ ও ভুল-ত্রুটির জন্য আন্তরিক তাওবা করার মাধ্যমে । হাজীরা এ মহিমান্বিত স্থানে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আল্লাহর যিকির, দু'আ ও কাকুতি-মিনতীতে ব্যস্ত থাকবেন। অতঃপর সূর্যাস্তের পর তারা মুযদালিফার দিকে শান্ত ও ধীরস্থিরভাবে রওনা হবেন এবং বেশি পরিমাণে তালবিয়া পড়বেন। প্রশস্ত স্থানে পৌঁছলে গতি কিছুটা বাড়াবেন, যেমন নবী

[1] সহীহ মুসলিম (নং: ১৩৪৮), আয়িশা রদিয়াল্লাহু আনহার হাদীস।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন। তবে সূর্যাস্তের আগে আরাফা থেকে প্রস্থান করা বৈধ নয়, কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্যাস্ত পর্যন্ত অবস্থান করেছেন এবং বলেছেন: "আমার থেকে তোমাদের হজের বিধান গ্রহণ করো।"

«خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ».

"তোমরা আমার কাছ থেকে হজের নিয়ম গ্রহণ কর।"[1]

অতঃপর যখন তারা মুযদালিফায় পৌঁছাবে, তখন সেখানে তারা মাগরিব তিন রাক'আত এবং এশা দুই রাক'আত একত্রে আদায় করবে, একবার আযান ও দুইবার ইকামতের মাধ্যমে, ঠিক যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন। তারা মুযদালিফায় মাগরিবের সময় পৌঁছাক বা এশার সময়ের পর, উভয় অবস্থায়ই এভাবে নামায আদায় করবে।

অনেক সাধারণ মানুষ মুযদালিফায় পৌঁছার পরই, সালাত আদায়ের আগেই, জামারার জন্য কঙ্কর সংগ্রহ করে এবং তাদের অনেকেই মনে করে এটি শরীয়তসম্মত। অথচ এটি একটি ভুল ধারণা, যার কোনো ভিত্তি নেই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুযদালিফা থেকে মিনা যাওয়ার পরই কঙ্কর সংগ্রহ করতে বলেছেন, এর আগে নয়। বস্তুত, যে কোনো জায়গা থেকে কঙ্কর সংগ্রহ করলেই তা যথেষ্ট হবে; শুধু মুযদালিফা থেকেই

---

[1] প্রাগুক্ত।

সংগ্রহ করতে হবে—এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। বরং মিনা থেকেও কঙ্কর সংগ্রহ করা জায়িয। সুন্নাত হলো, যিলহজ্জের ১০ তারিখে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়ামাল্লামের অনুসরণে সাতটি কঙ্কর সংগ্রহ করা, যা দিয়ে জামরাতুল আকাবাকে নিক্ষেপ করতে হবে। আর বাকী তিন দিনে প্রতিদিন ২১টি কঙ্কর সংগ্রহ করে তিনটি জামারার উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করতে হবে।

কঙ্করগুলি ধুয়ে নেওয়া সুন্নাত নয়; বরং না ধুয়েই নিক্ষেপ করতে হবে, কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবীগণ এটি করেননি। এছাড়াও আগে ব্যবহার করা কঙ্কর পুনরায় নিক্ষেপ করবে না।

হাজীকে এই রাতে মুযদালিফায় রাতযাপন করতে হবে। তবে নারীদের, শিশুদের এবং শারীরিকভাবে দুর্বলদের জন্য শেষ রাতে মিনার দিকে রওনা দেওয়ার অনুমতি রয়েছে, যেমনটি আয়েশা ও উম্মু সালামা রদিয়াল্লাহু আনহুমা সহ অন্যদের হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। অন্য হাজীদের ক্ষেত্রে মুযদালিফায় রাতযাপন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তারা ফযরের সালাত আদায় করে মাশ‘আরুল হারামের কাছে গিয়ে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াবে এবং ভোর হওয়ার আগ পর্যন্ত অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকির, তাকবীর ও দু‘আ করতে থাকবে। এখানে দু‘আ করার সময় হাত তোলা মুস্তাহাব। হাজীরা মুযদালিফার যে কোনো স্থানে দাঁড়ালে তা যথেষ্ট হবে,

মাশ‘আরুল হারামের নিকট যাওয়া বা এর উপর ওঠা তাদের জন্য আবশ্যক নয়। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«وَقَفْتُ هَاهُنَا - يَعْنِي عَلَى المَشْعَرِ الحَرَامِ - وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ».

"আমি এখানে অবস্থান করছি, তথা: মাশ‘আরুল হারামের কাছে, আর পুরো মুযদালিফাই অবস্থানের স্থান।"[1] এটি মুসলিম তার সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। আর (جمع) বলতে মুযদালিফাকে বোঝানো হয়েছে।

পরিষ্কার ভোর হয়ে গেলে তারা সূর্যোদয়ের আগেই মিনা অভিমুখে রওনা হবে এবং পথিমধ্যে বেশি বেশি তালবিয়া পাঠ করবে। আর যখন তারা ‘মুহাসসার’ উপত্যকায় পৌঁছাবে, তখন সামান্য দ্রুত চলা মুস্তাহাব।

যখন হাজিরা মিনায় পৌঁছাবে, তখন তারা জামারাতুল আকাবার কাছে পৌঁছে তালবিয়া পড়া বন্ধ করবে। এরপর তারা জামারাতুল আকাবায় পৌঁছে পরপর সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করবে। প্রতিটি কঙ্কর নিক্ষেপের সময় হাত উঁচু করবে এবং তাকবীর বলবে। মুস্তাহাব হলো, কঙ্কর নিক্ষেপ করার সময় বাতনে ওয়াদী থেকে নিক্ষেপ করবে, কাবা তাদের বাম পাশে এবং মিনা ডান পাশে থাকবে; কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন

---

[1] মুসলিম (নং: ১২১৮), জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ রদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

করেছেন। তবে অন্য দিক থেকে নিক্ষেপ করলেও তা সহীহ হবে, যদি কঙ্কর নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে পড়ে। আর শর্ত হলো, কঙ্করটি লক্ষ্যস্থলে পড়তে হবে; তবে সেখানে স্থায়ীভাবে থাকতে হবে এমন কোনো শর্ত নেই। যদি কঙ্কর লক্ষ্যস্থলে গিয়ে পড়ে এবং পরে সেখান থেকে বেরিয়ে যায়, তবুও তা যথেষ্ট হবে। অধিকাংশ আলেমের বক্তব্য থেকে এটি স্পষ্ট, এবং ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ তাঁর শারহুল মুহাযযাব গ্রন্থে এ মত ব্যক্ত করেছেন। জামারাতের জন্য ব্যবহৃত কঙ্করের আকার হবে খাযফ (নিক্ষেপের উপযোগী ছোট পাথর)-এর মতো, যা সাধারণত ছোলার দানার চেয়ে সামান্য বড় হয়।

এরপর কঙ্কর নিক্ষেপ করার পর হাজী তার কুরবানির পশু যবাই করবে। যবাই করার সময় মুস্তাহাব হলো এই দু'আ পড়া: "বিসমিল্লাহ, ওয়াল্লাহু আকবার, আল্লাহুম্মা হাযা মিনকা ওয়ালাকা"। অর্থ: "আল্লাহর নামে যবাই করছি, আল্লাহ মহান, হে আল্লাহ! এটি আপনার পক্ষ থেকে এবং আপনারই জন্য।" কুরবানির পশুকে কিবলার দিকে মুখ করে রাখা সুন্নত।

উট কুরবানী করার সুন্নত পদ্ধতি হলো: তাকে দাঁড় করিয়ে রাখা এবং তার বাঁ পায়ের হাঁটু বাঁধা, তারপর নহর করা (গলার নিচের অংশে বর্শা বা ছুরি প্রবেশ করানো)। আর গরু, ছাগল ও ভেড়া কুরবানী করলে তা বাঁ কাতে শুইয়ে যবাই করা সুন্নাত।

যদি কেউ কিবলার দিকে না ফিরিয়ে কুরবানী করে, তাহলে সে সুন্নাত পরিত্যাগ করল, তবে তার কুরবানী সহীহ হয়ে যাবে। কারণ, যবাইয়ের সময় পশুকে কিবলার দিকে ফিরানো সুন্নাত, ওয়াজিব নয়।

মুস্তাহাব হলো, কুরবানির মাংসের কিছু অংশ নিজে খাওয়া, কিছু অংশ উপহার দেওয়া এবং কিছু অংশ গরিবদের মাঝে সদকা করা। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন:

﴿...فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾

অতঃপর তোমরা তা থেকে খাও এবং দুঃস্থ, অভাবগ্রস্তকে আহার করাও। [আল-হাজ্জ, আয়াত: ২৮] কুরবানির সময়সীমা বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী, যিলহজ্জের ১০ তারিখ (ইয়াওমুন নাহর) থেকে শুরু হয়ে শেষ হয় তাশরীকের তৃতীয় দিনের (১৩ তারিখ) সূর্যাস্ত পর্যন্ত। অর্থাৎ, মোট চার দিন কুরবানী করার সুযোগ রয়েছে, ঈদের দিনসহ পরবর্তী তিন দিন।

কুরবানির পশু যবাই করার পর হাজীকে চুল মুণ্ডন (হালক) করতে বা ছোট (কসর) করতে হয়। তবে চুল মুণ্ডন করাই উত্তম, কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার মুণ্ডনকারীদের জন্য রহমত ও ক্ষমার দু'আ করেছেন, আর ছোট বা কসরকারীদের জন্য একবার।

শুধুমাত্র মাথার কিছু অংশ থেকে চুল কেটে নেয়া যথেষ্ট নয়;

বরং পুরো মাথা থেকে চুল ছোট করতে হবে, যেমনটি মুণ্ডন করার ক্ষেত্রে হয়। তবে নারীদের জন্য চুল মুণ্ডন নয়, বরং প্রতিটি বিনুনি বা চুলের গোছা থেকে এক আঙুল পরিমাণ বা তার চেয়ে কম পরিমাণ কাটা সুন্নাত।

জামারায়ে আকাবায় কংকর নিক্ষেপ এবং মাথা মুণ্ডানো বা চুল ছাঁটার পর ইহরামের কারণে হারাম হওয়া সবকিছু মুহরিমের জন্য হালাল হয়ে যায়, তবে স্ত্রীর সঙ্গে মিলন ব্যতীত। একে "প্রথম তাহাল্লুল" বা “প্রথম হালাল হওয়া” বলা হয়। এই হালাল হওয়ার পর সুন্নাহ হলো সুগন্ধি ব্যবহার করা এবং মক্কার দিকে রওনা হওয়া, যাতে তাওয়াফে ইফাদ্বা করা যায়। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত:

«كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِحَلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ».

“আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার ইহরামের জন্য ইহরামে প্রবেশের আগে সুগন্ধি লাগিয়ে দিতাম এবং হালাল হওয়ার জন্য বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করার আগেও অনুরূপ করতাম।”[1] সহীহ বুখারী ও মুসলিম।

এই তাওয়াফকে বলা হয় "তাওয়াফে ইফাদ্বা" বা "তাওয়াফে যিয়ারাহ"। এটি হজের অন্যতম রুকন (মূল স্তম্ভ), যা সম্পন্ন না

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস (১৫৩৯), সহীহ মুসলিম, হাদীস (১১৮৯)।

করলে হজ পূর্ণ হয় না। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٢٩﴾﴾

তারপর তারা যেন তাদের অপরিচ্ছন্নতা দূর করে এবং তাদের মানত পূর্ণ করে আর তাওয়াফ করে প্রাচীন ঘরের। [আল-হাজ্জ: ২৯]

তাওয়াফে ইফাদ্বা শেষ করার পর মাকামে ইবরাহীমের পেছনে দুই রাকাত সালাত আদায় করতে হবে। এরপর যদি কেউ তামাত্তু হজ আদায়কারী হয়, তাহলে সে সাফা ও মারওয়ার মাঝে সায়ী করবে। এটা তার হজের সায়ী আর প্রথম সায়ী তার উমরাহর সায়ী ছিল।

আলিমদের বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী এক্ষেত্রে তার জন্য একটি সায়ী যথেষ্ট হবে না; যেহেতু এ ব্যাপারে আয়েশা রদিয়াল্লাহু আনহার হাদীস রয়েছে, তিনি বলেছেন: "আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বের হলাম" এরপরে তিনি উক্ত হাদীসটি বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন, যার একটি অংশ হচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالحَجِّ مَعَ العُمْرَةِ ثُمَّ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا»...

"যার সাথে কুরবানির পশু থাকে, সে যেন হজের সঙ্গে উমরাহ মিলিয়ে ইহরাম বাঁধে, তারপর সে উভয় ইহরাম থেকে

মুক্ত হবে না, যতক্ষণ না উভয়ের কার্যাদি সম্পন্ন হয়।” ... এমনকি তিনি এ পর্যন্ত বলেছেন:

«فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالعُمْرَةِ بِالبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُّوا ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى لِحَجِّهِمْ».

“যারা উমরাহর জন্য ইহরাম বেঁধেছিল, তারা কাবা ঘর তাওয়াফ করলেন এবং সাফা-মারওয়ায় সায়ী করলেন, তারপর হালাল হলেন। এরপরে মিনা থেকে ফিরে এসে তারা তাদের হজ্জের জন্য আরেকটি তাওয়াফ করলেন।”[1] এটি বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

যারা উমরাহর জন্য ইহরাম বেঁধেছিল, তাদের সম্পর্কে আয়েশা রদিয়াল্লাহু আনহার এই কথার মাধ্যমে "এরপরে মিনা থেকে ফিরে এসে তারা তাদের হজ্জের জন্য আরেকটি তাওয়াফ করলেন।" সবচেয়ে বিশুদ্ধ মতানুসারে, তিনি এতে সাফা ও মারওয়ার মধ্যকার সায়ীকে বোঝাতে চেয়েছেন। আর যারা বলেছেন, তিনি এখানে তাওয়াফে ইফাদ্বা বোঝাতে চেয়েছেন, তাদের মত সঠিক নয়। কারণ, তাওয়াফে ইফাদ্বা সবার জন্য একটি আবশ্যিক রুকন এবং তারা সবাই তা সম্পন্ন করেছে। বরং এখানে উদ্দেশ্য হলো যা কেবলমাত্র ‘তামাত্তু’ আদায়কারীদের জন্য প্রযোজ্য, অর্থাৎ মিনা থেকে ফিরে এসে সাফা ও মারওয়ার

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস (১৫৫৬), সহীহ মুসলিম, হাদীস (১২১১)।

মধ্যে পুনরায় সায়ী করা, যা তাদের হজ সম্পূর্ণ করার অংশ। আল্লাহর প্রশংসা যে, এটি সুস্পষ্ট, এবং অধিকাংশ আলিমের মতও এটাই।

এ বিষয়ের সঠিকতা প্রমাণ করে ‘সহীহ বুখারী’ গ্রন্থে নিশ্চয়তার সাথে মু‘আল্লাক রূপে বর্ণিত একটি বর্ণনাও, যেখানে ইবনু আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহুমাকে হজ্জে তামাত্তু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি বলেছিলেন: “আনসার ও মুহাজির সাহাবীগণ এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণ ইহরাম বাঁধলেন, আর আমরাও ইহরাম বাঁধলাম। আমরা মক্কাতে পৌঁছালে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তোমরা হজের ইহরামকে ‘উমরাহতে পরিবর্তন করে নাও। তবে যারা কুরবানীর পশুর গলায় মালা ঝুলিয়েছে, তাদের কথা ভিন্ন। অতঃপর আমরা বাইতুল্লাহর তাওয়াফ ও সাফা মারওয়াতে সায়ী করলাম। এরপর স্ত্রীদের কাছে আসলাম (মিলিত হলাম) এবং সাধারণ কাপড় পরিধান করলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: যে ব্যক্তি কুরবানীর জন্য উপস্থিত করার উদ্দেশ্যে পশুর গলায় মালা পরিয়েছে, পশু কুরবানীর স্থানে না পৌঁছা পর্যন্ত সে হালাল হতে পারবে না। এরপর যিলহজ মাসের আট তারিখ বিকালে আমাদেরকে হজের ইহরাম বাঁধার নির্দেশ দেন। যখন আমরা হজের সকল কার্য শেষ করে বাইতুল্লাহর

তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়া সায়ী করে অবসর হলাম।”[1] উদ্দিষ্ট বিষয়টি সমাপ্ত হলো, এবং এটি স্পষ্টভাবে প্রমাণ হলো যে, তামাত্তু হজ আদায়কারী দুইবার সায়ী করবে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

আর মুসলিম যে হাদীসটি জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন: “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার সাহাবীগণ শুধুমাত্র একবারই সাফা ও মারওয়া’র মধ্যে সায়ী করেছেন।”[2] তাদের প্রথম তাওয়াফটি সেই সাহাবীদের জন্য বোঝানো হয়েছে, যারা হাদী (কুরবানির পশু) সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন; কারণ তারা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ইহরাম অবস্থায়ই থেকে গিয়েছিলেন, যতক্ষণ না তারা হজ ও উমরাহ উভয় থেকেই একসঙ্গে মুক্ত হলেন। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ ও উমরাহ উভয়ের নিয়তে ইহরাম বেঁধেছিলেন এবং যারা হাদী সঙ্গে এনেছিল তাদেরকে তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তারা যেন হজ ও উমরাহ উভয়ের জন্য ইহরাম বাঁধে এবং একসঙ্গে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত হালাল না হয়। হজ ও উমরাহ একসঙ্গে আদায় করা ব্যক্তি (কিরান হজ আদায়কারী)-এর জন্য শুধু একটি মাত্র সায়ী যথেষ্ট, যেমনটি জাবির রদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীস ও অন্যান্য সহীহ হাদীস

---

[1] সহীহ বুখারী (নং: ১৫৭২)।

[2] সহীহ মুসলিম, হাদীস (১২১৫)

দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে।

এভাবে যে শুধু হজ (ইফরাদ) পালন করবেন এবং হজের ইহরাম অবস্থায় নহরের দিন পর্যন্ত থাকবেন, তার জন্য একটি সায়ী করা যথেষ্ট। সুতরাং যিনি কিরান আদায়কারী (হজ এবং উমরাহ একসাথে আদায়কারী) এবং মুফরিদ (শুধু হজ আদায়কারী) তারা, পবিত্র ভূমিতে প্রবেশের সময় (তাওয়াফে কুদুম) সায়ী করলে তা তাওয়াফে ইফাদ্বাহর পরে আরেকটি সায়ী না করলেও হবে। এটি আয়েশা, ইবনু আব্বাস এবং জাবিরের হাদীসগুলির মধ্যে সমন্বয় বিধান করে, যাতে সমস্ত হাদীসের উপরে আমল করা সম্ভব হয়।

এবং এই সমন্বয়ের পক্ষে আরও একটি দলিল হলো যে, আয়েশা ও ইবনু আব্বাসের হাদীস দুটি সহীহ এবং এতে মুতামাত্তি' (যিনি উমরাহ করে হজের জন্য হালাল হয়েছেন) তার জন্য দ্বিতীয়বার সায়ী করার বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে। অন্যদিকে জাবিরের হাদীসের বাহ্যিক অর্থ এটিকে নাকচ করেছ, কিন্তু উসূলুল ফিকহ (ফিকহের মূলনীতি) ও মুস্তালাহুল হাদীস (হাদীসের পরিভাষা)-এর মূলনীতি অনুযায়ী নিয়ম হচ্ছে: "সাব্যস্ত বিষয় নাকচের উপরে প্রাধান্য পায়।" আল্লাহই সত্যের পথপ্রদর্শক, আর আল্লাহ ছাড়া কারও শক্তি ও সামর্থ্য নেই।

অধ্যায়

কুরবানির দিনে হাজীর জন্য সর্বোত্তম করণীয় সংক্রান্ত আলোচনা

হাজীর জন্য উত্তম হলো কুরবানির দিন চারটি আমলকে নিম্নোক্ত ক্রমানুসারে সম্পন্ন করা: ০১. প্রথমে জামারায়ে আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করা, ০২.

তারপর হাদী (কুরবানির পশু) জবাই করা, ০৩. এরপর চুল মুন্ডানো বা ছেঁটে ফেলা এবং ০৪. সবশেষে কা'বায় গিয়ে তাওয়াফে ইফাদ্বাহ সম্পন্ন করা আর তামাত্তু হাজীকে এরপর সায়ীও করতে হবে। ইফরাদ ও কিরান আদায়কারী হাজীগণ যদি তাওয়াফে কুদূমের সঙ্গে সায়ী না করে থাকেন, তাহলে তাদেরও তাওয়াফের পর সায়ী করতে হবে।

যদি কেউ এই ক্রম পরিবর্তন করে, তবে তাও বৈধ হবে, কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে ছাড় দিয়েছেন। এমনকি কেউ যদি সায়ীকে তাওয়াফের আগে করে ফেলে, তাও অনুমোদিত। এ প্রসঙ্গে এক সাহাবী বর্ণনা করেছেন: "সেদিন (১০ই জিলহজ) যে ব্যক্তিই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আগে অথবা পরে করার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তিনি তাকেই বলেছিলেন:

«افْعَلْ وَلَا حَرَجَ».

“করো, কোন সমস্যা নেই।”[1] তাছাড়া এটি যেহেতু ভুলে ও অজ্ঞতার কারণে ঘটে যেতে পারে, তাই এটি উক্ত সাধারণ বিধানের অন্তর্ভুক্ত হওয়া জরুরি। কারণ এতে সহজতা ও সুবিধার দিকটি রয়েছে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এটা সাব্যস্ত হয়েছে যে, তাকে তাওয়াফের আগে সায়ী করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি বলেছিলেন:

«لَا حَرَجَ».

“কোন সমস্যা নেই।”[2] এটি আবু দাউদ উসামা ইবনু শারীক সূত্রে সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন। এতে কোনো সন্দেহ ছাড়াই উক্ত বিষয়টির সাধারণ বিধানের অন্তর্ভুক্ত হওয়া স্পষ্ট হয়েছে। আল্লাহই তাওফীক দাতা।

যে কাজগুলো সম্পন্ন করলে হাজি পূর্ণরূপে ইহরামমুক্ত হন, সেগুলো হলো তিনটি: (১) জামরায়ে আকাবাতে কঙ্কর নিক্ষেপ (২) মাথা মুণ্ডানো বা চুল ছাঁটা, এবং (৩) তাওয়াফে ইফাদ্বা করা ও পরে সায়ী সম্পন্ন করা, যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। যদি হাজি এই তিনটি কাজ সম্পন্ন করেন, তবে তার জন্য সবকিছু হালাল হয়ে যাবে, যা ইহরামের কারণে নিষিদ্ধ ছিল: নারী, সুগন্ধি

---

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস (৮৩), সহীহ মুসলিম, হাদীস (১৩০৬)।

[2] আবূ দাউদ, হাদীস নং (২০১৫)।

ও অন্যান্য বিষয়সহ। আর যদি তিনি এর মধ্যে দুটি কাজ করেন, তবে তার জন্য সবকিছু হালাল হয়ে যাবে, তবে স্ত্রীদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন ছাড়া। এটিকে বলা হয়: "প্রথম পর্যায়ের ইহরাম মুক্তি"।

হাজির জন্য যমযমের পানি পান করা, তা পর্যাপ্ত পরিমাণে পান করে তৃপ্ত হওয়া এবং কল্যাণকর যে কোনো দু'আ করা মুস্তাহাব। এবং

«مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ».

"যমযমের পানি যে জন্য পান করা হয়, তা সে উদ্দেশ্যেই হয়।"[1] যেমন সহীহ মুসলিমে আবূ যার রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে যে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যমযমের পানি সম্পর্কে বলেছেন:

«إِنَّهُ طَعَامُ طُعْمٍ».

"এটি এমন খাদ্য যা খাদ্যরূপে দেওয়া হয়েছে।"[2] আবু দাউদ আরো বৃদ্ধি করেছেন:

«وَشِفَاءُ سُقْمٍ».

---

[1] ইবনু মাজাহ, জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ রদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে (নং: ৩০৬২)।

[2] সহীহ মুসলিম, হাদীস (২৪৭৩)।

"এবং তা রোগের চিকিৎসা।" ([1]

তাওয়াফে ইফাদ্বাহ ও যাদের ওপর সায়ী ওয়াজিব তারা সায়ী সম্পন্ন করার পর হাজীগণ মিনাতে ফিরে যাবেন এবং সেখানে তিন দিন তিন রাত অবস্থান করবেন। এ সময় তারা প্রতিদিন সূর্য ঢলে যাওয়ার পর তিনটি জামারায় কঙ্কর নিক্ষেপ করবেন, এবং এতে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা আবশ্যক।

এক্ষেত্রে প্রথমে প্রথম জামারায়, যা মসজিদে খাইফের নিকটবর্তী, সাতটি কঙ্কর একের পর এক নিক্ষেপ করবেন। প্রতিটি কঙ্কর নিক্ষেপের সময় তিনি হাত উঁচু করবেন। এরপর সুন্নত হলো, তিনি কিছুটা পিছিয়ে এসে জামারাকে বাম পাশে রেখে কিবলামুখী হবেন, উভয় হাত উত্তোলন করে বেশি বেশি দু'আ ও বিনয়সহ প্রার্থনা করবেন।

তারপর তিনি প্রথম জামারার মতোই দ্বিতীয় জামারায় কঙ্কর নিক্ষেপ করবেন। এরপর সুন্নাত হলো, তিনি কিছুটা সামনে এগিয়ে এসে জামারাকে ডান পাশে রেখে কিবলামুখী হবেন, উভয় হাত উত্তোলন করে বেশী বেশী দু'আ করবেন।

এরপরে তৃতীয় জামারাতে কঙ্কর নিক্ষেপ করবেন, তবে তার

[1] অর্থাৎ: আবু দাউদ আত-ত্বয়ালিসী, তিনি আবু যার রদিয়াল্লাহু আনহুর ইসলাম গ্রহণের ঘটনার মধ্যে একই হাদীস বর্ণনা করেছেন। দেখুন: আবু দাউদ আত-ত্বয়ালিসীর মুসনাদ, (নং: ৪৫৯)।

কাছে অবস্থান করবেন না।

তারপর সে তাশরীকের দ্বিতীয় দিনে প্রথম দিনের মত সূর্য ঢলে পড়ার পর জামারাগুলোতে কঙ্কর নিক্ষেপ করবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণে প্রথম ও দ্বিতীয় জামারায় প্রথম দিনের মতোই করবে।

তাশরীকের প্রথম দুটি দিনে কঙ্কর নিক্ষেপ করা হজ্জের আবশ্যকীয় কর্তব্যগুলোর অন্তর্ভুক্ত। একইভাবে প্রথম ও দ্বিতীয় রাত মিনায় থাকা ওয়াজিব, তবে পানি সরবরাহকারী ও পশুপালকদের মতো বিশেষ প্রয়োজনীয় কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের জন্য এটি আবশ্যক নয়।

তারপর উল্লিখিত দুই দিনের রমী (পাথর নিক্ষেপ) সম্পন্ন করার পর, যদি কেউ মিনা থেকে দ্রুত বিদায় নিতে চায়, তাহলে তার জন্য তা বৈধ, তবে তাকে সূর্যাস্তের আগে মিনা ত্যাগ করতে হবে। আর যে ব্যক্তি বিলম্ব করে তৃতীয় রাত মিনায় অবস্থান করে ও তৃতীয় দিনেও জামারাতে কঙ্কর নিক্ষেপ করে, তার জন্য তা উত্তম এবং অধিক সওয়াবের কাজ। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى...﴾

আর তোমরা গোনা দিনগুলোতে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করবে।

অতঃপর যদি কেউ তাড়াতাড়ি করে দুই দিনে চলে আসে তবে তার কোনো পাপ নেই এবং যে ব্যক্তি বিলম্ব করে আসে তারও কোনো পাপ নেই। এটা তার জন্য যে তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে... [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২০৩] এ কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের জন্য তাড়াতাড়ি বিদায় নেওয়ার অনুমতি দিয়েছেন, কিন্তু তিনি নিজে তাড়াহুড়া করেননি। বরং তিনি মিনায় অবস্থান করেছেন এবং ১৩ই জিলহজ দিনের সূর্য ঢলে পড়ার পরে জামারাতে কঙ্কর নিক্ষেপ করেছেন, তারপর যোহরের সালাত আদায় করার আগেই মিনা ত্যাগ করেছেন।

এবং যে শিশু নিজে নিজে রমী করতে অক্ষম, তার অভিভাবক তার পক্ষ থেকে জামারাতে পাথর নিক্ষেপ করতে পারে, তবে আগে সে নিজের পক্ষ থেকে রমী করবে। এভাবে ছোট মেয়ে শিশুর ক্ষেত্রেও একই বিধান প্রযোজ্য, তার অভিভাবক তার পক্ষ থেকে রমী করবে। যেমন জাবির রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে এসেছে:

«حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَمَعَنَا النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ، فَلَبَّيْنَا عَنِ الصِّبْيَانِ وَرَمَيْنَا عَنْهُمْ».

“আমরা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হজ করেছিলাম, আমাদের সাথে নারী ও শিশুরাও ছিল, তখন আমরা শিশুদের পক্ষ হতে তালবিয়া পাঠ করেছিলাম এবং

তাদের পক্ষ থেকে কঙ্কর নিক্ষেপ করেছিলাম।”[1] হাদীসটি ইবনু মাযাহ বর্ণনা করেছেন।

আর যে ব্যক্তি অসুস্থতা, বার্ধক্য বা গর্ভধারণের কারণে রমী (জামারাতে কঙ্কর নিক্ষেপ) করতে অক্ষম, সে অন্য কাউকে নিজের পক্ষ থেকে রমী করার জন্য (প্রতিনিধি) নিযুক্ত করবে; কেননা আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ...﴾

সুতরাং তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর... [সূরা আত-তাগাবুন, আয়াত: ১৬] আর এ ধরনের লোকেরা জনতার ভিড়ে জামারাতের কাছে পৌঁছাতে সক্ষম নয় এবং কংকর নিক্ষেপের নির্ধারিত সময় পার হয়ে গেলে তাদের জন্য সেটা কাজা করারও কোনো বিধান নেই। তাই তাদের জন্য প্রতিনিধি নিযুক্ত করা বৈধ করা হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য ইবাদাতের ক্ষেত্রে এরূপ বৈধ নয়। তাই ইহরামধারীর উচিত নয়, অন্য কাউকে তার পক্ষ থেকে হজের কোনো আমল সম্পন্ন করতে বলা, যদিও তা নফল হজ হয়। কেননা যে ব্যক্তি হজ এবং উমরাহর জন্য ইহরাম বেঁধেছে, যদিও তা নফল হয়ে থাকে, তখন তা পূর্ণ করা আবশ্যক হয়ে যায়। কেননা আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

---

[1] তিরমিযী, হাদীস নং (৯২৭)।

﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ...﴾

আর তোমরা হজ ও 'উমরা পূর্ণ কর আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে... [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৯৬] তাছাড়া তাওয়াফ ও সায়ীর সময় শেষ হয় না, কিন্তু এর বিপরীতে রমীর সময় সীমিত, যা শেষ হয়ে যেতে পারে।

আরাফায় অবস্থান, মুযদালিফা ও মিনায় রাতযাপন, এসবের নির্দিষ্ট সময় শেষ হয়ে যায়, এতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে অক্ষম ব্যক্তির জন্য এসব স্থানে উপস্থিত হওয়া কিছুটা কষ্টকর হলেও সম্ভব। কিন্তু এর বিপরীতে রমী নিজ হাতে করা তার জন্য কঠিন হতে পারে। তাছাড়া সালাফদের পক্ষ থেকে প্রমাণ রয়েছে যে, অক্ষম ব্যক্তির জন্য রমীতে প্রতিনিধিত্ব করা বৈধ, কিন্তু অন্যান্য ইবাদাতের ক্ষেত্রে এর অনুমোদন নেই।

ইবাদাতসমূহ তাউক্বীফী (শরী'আত নির্ধারিত বিধান), সুতরাং কেউ কোনো ইবাদাত নিজের পক্ষ থেকে প্রমাণ ব্যতিরেকে নির্ধারণ করতে পারে না। যে ব্যক্তি অন্যের পক্ষ থেকে রমী (কংকর নিক্ষেপ) করবে, সে নিজের রমী করার পর একই স্থানে থেকেই তিনটি জামারার প্রতিটিতে বদলী ব্যক্তির পক্ষ থেকে রমী করতে পারে। তাকে অবশ্যই প্রথমে নিজের রমী সম্পন্ন করে তারপর ফিরে এসে বদলী ব্যক্তির পক্ষ থেকে পুনরায় রমী করতে হবে– এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। কারণ এর পক্ষে কোনো

নির্দিষ্ট দলীল নেই এবং এতে অনাবশ্যক কষ্ট ও অসুবিধার সৃষ্টি হয়। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿...وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ...﴾

আর তিনি দীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোনো সংকীর্ণতা রাখেননি [সূরা আল-হজ্জ, আয়াত: ৭৮] আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا».

"তোমরা সহজ করো, কঠিন করো না।"[1] এছাড়াও এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের কাছ থেকে বর্ণিত হয়নি যে, যখন তারা তাদের শিশুদের বা অক্ষম ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে রমী করতেন, তখন তারা প্রথমে নিজেদের রমী সম্পন্ন করে পুনরায় ফিরে এসে তারপরে তাদের পক্ষ থেকে রমী করতেন। যদি তারা এভাবে করতেন, তবে অবশ্যই এটি বর্ণিত হতো। কারণ এটি এমন একটি বিষয়, যা সংরক্ষণ ও বর্ণনার ব্যাপারে মানুষের গুরুত্ব ছিল। আর আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

অধ্যায়

কিরান ও তামাত্তু হজ আদায়কারীর জন্য দম (কুরবানী) আবশ্যক হওয়ার আলোচনা

[1] বুখারী (নং: ৬৯), আনাস রদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে।

যদি হাজী তামাত্তু বা কিরান হজ পালন করেন এবং তিনি মসজিদুল হারামের অধিবাসী না হন, তবে তার জন্য একটি দম (কুরবানী) দেওয়া ওয়াজিব। এটি হতে পারে একটি ছাগল বা ভেড়া, অথবা একটি গরু বা উটের সাত ভাগের এক ভাগ। এই কুরবানির পশু অবশ্যই হালাল অর্থ দ্বারা হতে হবে এবং বিশুদ্ধ উপায়ে অর্জিত হতে হবে; কারণ আল্লাহ তা'আলা পবিত্র, এবং তিনি শুধু পবিত্র বস্তুই গ্রহণ করেন।

মুসলিম ব্যক্তির উচিত মানুষের কাছে হাদী (কুরবানির পশু) বা অন্য কিছু চাওয়া থেকে বিরত থাকা, তা রাজা-বাদশাহ হোক বা সাধারণ মানুষ। যদি আল্লাহ তা তাকে নিজ সম্পদ থেকে হাদী দেওয়ার সামর্থ্য দেন এবং অন্যের সহায়তা ছাড়াই তার প্রয়োজন মিটে যায়, তবে তাই উত্তম। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত বহু হাদীসে মানুষের কাছে চাওয়ার নিন্দা করা হয়েছে এবং তা পরিত্যাগকারীকে প্রশংসা করা হয়েছে।

যদি তামাত্তু ও কিরান হজ আদায়কারী হাদী (কুরবানির পশু) দিতে অক্ষম হয়, তবে তার জন্য তিন দিন হজের সময় এবং নিজ গৃহে ফিরে গিয়ে সাতদিন সিয়াম পালন করা আবশ্যক। সে চাইলে এই তিন দিনের সিয়াম ইয়াওমুন নাহর তথা কুরবানির দিনের পূর্বে রাখতে পারে, অথবা চাইলে তা তাশরীকের তিন দিনের মধ্যে রাখতে পারবে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿...فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ...﴾

অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ হবে তখন তোমাদের মধ্যে যে কেউ উমরাকে হজের সঙ্গে মিলিয়ে লাভবান হতে চায় সে সহজলভ্য হাদঈ যবাই করবে। কিন্তু যদি কেউ তা না পায়, তবে তাকে হজের সময় তিন দিন এবং ঘরে ফিরার পর সাত দিন এ পূর্ণ দশ দিন সিয়াম পালন করতে হবে। এটা তাদের জন্য, যাদের পরিজনবর্গ মসজিদুল হারামের বাসিন্দা নয়। [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৯৬] আয়াতটি শেষ পর্যন্ত।

সহীহ বুখারীতে আয়েশা ও ইবনু উমার রদিয়াল্লাহু আনহুম থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা উভয়ে বলেছেন:

«لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الهَدْيَ».

"তাশরীকের দিনগুলোতে সিয়াম পালনের অনুমতি কাউকে দেওয়া হয়নি, তবে কেবল সেই ব্যক্তির জন্য অনুমতি রয়েছে, যে হাদী (কুরবানির পশু) সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়নি।"[1] এটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথার অন্তর্ভুক্ত (মারফূ হাদীস) বলে গণ্য হবে। আর সর্বোত্তম হলো, এই তিনদিন আরাফার দিনের পূর্বে সিয়াম পালন করা, যাতে আরাফার দিন সে সিয়াম

[1] বুখারী (নং: ১৯৯৮)।

ভঙ্গ করে থাকতে পারে। এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফার দিন সিয়াম ছাড়াই আরাফাতে অবস্থান করেছেন এবং আরাফার দিন আরাফায় সিয়াম রাখতে নিষেধ করেছেন। তাছাড়া এই দিনে সিয়াম না রাখা তার জন্য দু'আ ও আল্লাহর যিকিরের অধিক মনোযোগী হওয়া সহজ করবে। উল্লেখিত তিনটি সিয়াম ধারাবাহিকভাবে বা বিচ্ছিন্নভাবে রাখা জায়িয। অনুরূপভাবে পরবর্তী সাতটি সিয়ামের ক্ষেত্রেও ধারাবাহিকভাবে রাখা আবশ্যক নয়; বরং একসঙ্গে বা আলাদা আলাদাভাবে রাখা বৈধ। কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এই সাতটি সিয়ামের ক্ষেত্রে ধারাবাহিক রাখার শর্ত আরোপ করেননি এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তা করেননি। তবে সর্বোত্তম হলো—এই সাতটি সিয়াম নিজ পরিবারে ফিরে গিয়ে রাখা; কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন:

﴿...وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ...﴾

আর সাত দিন ঘরে ফিরার পর [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৯৬]

হাদীর ব্যবস্থা করতে অক্ষম ব্যক্তির জন্য সিয়াম পালন করা রাজা-বাদশা বা অন্য কারও নিকট থেকে হাদী চেয়ে নেওয়ার চেয়ে উত্তম। তবে কেউ যদি নিজে থেকে তাকে হাদী বা অন্য কিছু দান করে এবং সে তা চাওয়া বা তার প্রতি লালায়িত হওয়ার

আগেই পেয়ে যায়, তাহলে তা গ্রহণ করা দোষণীয় নয়, যদিও সে অন্যের পক্ষ থেকে হজ করে থাকে। অর্থাৎ, যদি তার জন্য নিযুক্তকারী তাকে দেওয়া অর্থ থেকে হাদী ক্রয়ের শর্ত না রাখে, তবে তা বৈধ।কিন্তু কিছু লোক যা করে—সরকার বা অন্য কারও নিকট থেকে মিথ্যা নামে হাদী চেয়ে নেওয়া, যা আদতে ভিত্তিহীন, এটি নিঃসন্দেহে হারাম। কারণ, এটি মিথ্যার মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের শামিল। আল্লাহ আমাদের এবং সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে এ ধরনের গুনাহ থেকে রক্ষা করুন।

অধ্যায়

হাজী ও অন্যান্যদের উপর সৎকাজের আদেশ করা ওয়াজিব হওয়ার আলোচনা

হাজীদের উপরে ও অন্যান্যদের উপরে অন্যতম সবচেয়ে বড় ওয়াজিব হল সৎকাজের আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধ করা। জামা'আতের সাথে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়ে দায়িত্বশীল হওয়া। যেমনটি আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কিতাবে এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষায় আদেশ করেছেন।

আর মক্কাবাসীদের মধ্যে অধিকাংশ মানুষ ঘরে সালাত আদায় করে এবং মাসজিদ থেকে বিমুখ হয়ে থাকে, এতে মূলত তারা শরী'আত বিরোধী ভুল কাজ করছে। এমন কাজে নিষেধ করা এবং মাসজিদে নিয়মিত সালাত আদায়ের ব্যাপারে আদেশ করা

ওয়াজিব। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এটা সাব্যস্ত হয়েছে যে, ইবনু উম্মে মাকতুম রদিয়াল্লাহু আনহু অন্ধ ছিলেন এবং মসজিদ থেকে তার ঘরও দূরবর্তী ছিল। তবুও ইবনু উম্মে মাকতুম রদিয়াল্লাহু আনহু যখন ঘরে সালাত আদায়ের অনুমতি চাইলেন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছিলেন:

«هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَجِبْ».

"তুমি কী সালাতের আযান শুনতে পাও?" তিনি বললেন: জ্বী, তিনি জবাব দিলেন: "তাহলে সাড়া দাও।"[1] অন্য বর্ণনায় এসেছে:

«لَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً».

"আমি তোমার জন্য কোন সুযোগ পাচ্ছি না।"[2] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন:

«لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ إِلَى رِجَالٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ».

"আমার ইচ্ছা হয় যে, আমি সালাত কায়েম করার আদেশ দেই, তারপর একজন ব্যক্তিকে নির্দেশ দেই যেন সে মানুষদের ইমামতি করে, এরপর আমি এমন কিছু লোকের কাছে যাই, যারা সালাতে উপস্থিত হয় না, এবং তাদের ঘরগুলিকে আগুন দিয়ে

---

[1] সহীহ বুখারী (নং: ২৪২০), সহীহ মুসলিম (নং: ৬৫১)।

[2] আবু হুরাইরা রদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে মুসলিম বর্ণনা করেছেন (নং: ৬৫৩)।

জ্বালিয়ে দেই।”[1] সুনানে ইবনে মাজাহ ও অন্যান্যরা হাসান সনদে ইবনু আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ».

“যে ব্যক্তি সালাতের আহ্বান (আযান) শুনতে পেল, অথচ জামা‘আতে উপস্থিত হলো না, তাহলে তার সালাত হবে না, তবে উযর থাকলে ভিন্ন কথা।”[2] সহীহ মুসলিমে ইবনু মাস‘উদ রদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: “যে ব্যক্তি কাল কিয়ামাতের দিন মুসলিম হিসেবে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে আনন্দবোধ করে, সে যেন ঐ সকল সালাতের রক্ষণাবেক্ষণ করে, যেসব সালাতের জন্য আহ্বান করা (আযান দেওয়া) হয়। কেননা আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের নবীর জন্য হিদায়াতের পথ বিধিবদ্ধ করেছেন। আর এসব সালাতও হিদায়াতের পথের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। যেমন জনৈক ব্যক্তি সালাতের জামা’আতে উপস্থিত না হয়ে বাড়ীতে সালাত আদায় করে থাকে, অনুরূপ তোমরাও যদি তোমাদের বাড়ীতে সালাত আদায় করো তাহলে নিঃসন্দেহে তোমরা তোমাদের নবীর সুন্নাত পরিত্যাগ করলে। আর তোমরা যদি এভাবে তোমাদের নবীর সুন্নাত বা পদ্ধতি পরিত্যাগ করো

[1] আব্দুল্লাহ ইবনু উম্মু মাকতুম সূত্রে আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন (নং: ৫৫২)।

[2] সহীহ মুসলিম (নং: ৬৫৪)।

তাহলে অবশ্যই পথ হারিয়ে ফেলবে। কেউ যদি অতি উত্তমভাবে পবিত্রতা অর্জন করে কোন একটি মাসজিদে উপস্থিত হয় তাহলে মাসজিদে যেতে সে যতবার পদক্ষেপ ফেলবে তার প্রতিটি পদক্ষেপের পরিবর্তে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য একটি করে নেকী লিপিবদ্ধ করেন, তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন এবং তার থেকে একটি করে পাপ দূর করে দেন। আমরা মনে করি সর্বজন পরিচিত মুনাফিক এমন ব্যক্তি ছাড়া কেউই জামা'আতে সালাত আদায় করা ছেড়ে দেয় না। অথচ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এমন ব্যক্তি জামা'আতে উপস্থিত হত যাকে দু'জন মানুষের কাঁধে ভর দিয়ে এসে সালাতের কাতারে দাঁড় করিয়ে দেয়া হত।"[1]

হজ পালনকারীদের এবং অন্যান্য সকল মানুষের জন্য আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজগুলো থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক এবং সেগুলো করা থেকে সতর্ক থাকা জরুরি। যেমন: ব্যভিচার, সমকামিতা, চুরি, সুদ খাওয়া, ইয়াতীমের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করা, লেনদেনে প্রতারণা করা, আমানতের খেয়ানত করা, মাদক পান করা, ধূমপান করা, কাপড় টাখনুর নিচে নামানো, অহংকার করা, হিংসা করা, রিয়া (লোক দেখানো কাজ) করা, পরনিন্দা করা, চোগলখোরি করা, মুসলমানদের নিয়ে উপহাস করা, বাদ্যযন্ত্র

[1] ইবনু আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহুমা সূত্রে আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন (নং: ৫৫১)।

ব্যবহার করা; যেমন: গ্রামোফোন, বেহালা, রাবাব, বাঁশি এবং এ ধরনের অন্যান্য যন্ত্র। তেমনি গান শোনা, রেডিও বা অন্য কোনো মাধ্যমে বাদ্যযন্ত্রের সুর শোনা, পাশা খেলা, দাবা খেলা, জুয়া খেলা এবং প্রাণীর ছবি আঁকা বা তাতে সন্তুষ্ট থাকা—এসবও আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজগুলোর অন্তর্ভুক্ত। এসব পাপকাজ আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য সব সময় এবং সব জায়গায় হারাম করেছেন। তবে, পবিত্র মক্কায় বসবাসকারী এবং সেখানে হজ পালনের উদ্দেশ্যে আগতদের জন্য এসব গুনাহ থেকে বিরত থাকা আরও বেশি জরুরি, কারণ এই পবিত্র নগরীতে গুনাহ করা আরও গুরুতর এবং তার শাস্তিও অধিক কঠোর হতে পারে।

আর আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

﴿...وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۝٢٥﴾

আর যে সেখানে অন্যায়ভাবে 'ইলহাদ' তথা দীনবিরোধী পাপ কাজের ইচ্ছে করে তাকে আমরা আস্বাদন করাব যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। [আল-হজ্জ : ২৫] যেহেতু আল্লাহ ঐসব মানুষকে হুমকি দিয়েছেন যারা হারামে অন্যায় ও জুলুম করার চেষ্টা করবে, তাহলে যারা উক্ত কাজে লিপ্ত হবে, তাদের শাস্তি কেমন হতে পারে? সন্দেহ নেই যে, এটি আরো বেশী ভয়ানক ও কঠিন। সুতরাং, এই ধরনের পাপ থেকে ও সকল ধরনের গুনাহ থেকে নিজেকে বাঁচানো আবশ্যক।

আর হাজীদের জন্য হজের সওয়াব ও গুনাহ মাফ হওয়ার বিষয়টি শুধু তখনই ঘটে যখন তারা এসব গোনাহ ও অন্যান্য যেসব কিছু আল্লাহ তাদের জন্য হারাম করেছেন, সেগুলোর থেকে সাবধান থাকে। যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ».

“যে ব্যক্তি হজ পালন করল এবং (তাতে) কোনো অশ্লীল কাজ করল না ও পাপাচার করল না, সে ব্যক্তি ঠিক ঐ দিনকার মত (নিষ্পাপ হয়ে) বাড়ি ফিরবে, যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছিল।”[1]

এমন গর্হিত কাজগুলোর চেয়েও মারাত্মক ও ভয়াবহ হলো: মৃত ব্যক্তিদেরকে ডাকা, তাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা, তাদের নামে মানত করা এবং তাদের উদ্দেশ্যে পশু যবেহ করা। এইসব কাজ তারা করে এই আশায় যে, তারা আল্লাহর কাছে তাদের জন্য সুপারিশ করবে, তাদের রোগীকে সুস্থ করে দেবে, তাদের নিখোঁজ ব্যক্তিকে ফিরিয়ে দেবে অথবা এ ধরনের অন্য কোনো প্রয়োজনে সহায়তা করবে।

এটা শিরকে আকবারের অন্তর্ভুক্ত, যা আল্লাহ হারাম করেছেন। আর এটা হচ্ছে মুশরিকদের দীন, অথচ আল্লাহ তা‘আলা অসংখ্য

[1] বুখারী, আবু হুরাইরা রদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে (নং: ১৫২১) এবং মুসলিম, (নং: ১৩৫০)।

রাসূল প্রেরণ করেছেন এটাকে নাকচ ও নিষিদ্ধ ঘোষণার জন্য।

অতএব হজ পালনকারীসহ প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত এসব গুনাহ থেকে সতর্ক থাকা এবং যদি পূর্বে এসব পাপকর্ম করে থাকে, তবে আল্লাহর কাছে প্রকৃতভাবে তাওবাহ করা। আর যদি কেউ শিরক বা অন্য কোনো বড় গুনাহ করে থাকে, তবে তাওবাহ করার পর নতুনভাবে হজ করা উচিত। কারণ বড় শিরক সব আমল বিনষ্ট করে দেয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿...وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝٨٨﴾

আর যদি তারা শির্ক করত তবে তাঁদের কৃতকর্ম নিস্ফল হত [সূরা আল-আন'আম, আয়াত: ৮৮]

শিরকে আসগর (ছোট শিরক) এর একটি উদাহরণ হলো আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে কসম খাওয়া; যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, কা'বা, আমানত ইত্যাদির নামে কসম খাওয়া।

এছাড়াও এর মধ্যে রয়েছে: রিয়া (অন্যদের সামনে ভালো কাজ প্রদর্শন করা), খ্যাতির আশা, এবং এমন কথা বলা: "যা আল্লাহ ইচ্ছে করেন এবং আপনি ইচ্ছে করেন।", বা "যদি আল্লাহ এবং আপনি না থাকতেন", বা "এটি আল্লাহর এবং আপনার পক্ষ থেকে" ইত্যাদি কথা।

সুতরাং এসব শিরকী কর্মকাণ্ড থেকে সতর্ক থাকা এবং একে

অপরকে তা পরিত্যাগ করার উপদেশ দেওয়া জরুরী; কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ».

“যে ব্যক্তি আল্লাহর নাম ব্যতীত অন্য কিছুর নামে শপথ করল সে যেন কুফরী করল অথবা শিরক করল।”[1] আহমাদ, আবু দাউদ এবং তিরমিযী এটি সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন।

সহীহ হাদীসে উমার রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ».

“যে ব্যক্তি শপথ করবে, সে যেন আল্লাহর শপথ করে। অন্যথায় যেন চুপ থাকে।”[2] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন:

«مَنْ حَلَفَ بِالأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا».

“যে ব্যক্তি আমানতের ওপর কসম খাবে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।”[3] সুনানে আবূ দাউদ।

তিনি আরো বলেন,

«أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكَ الأَصْغَرَ، فَسُئِلَ عَنْهُ فَقَالَ: الرِّيَاءُ».

“আমি তেমাদের ওপর যে বিষয়ে সবচেয়ে বেশী ভয় করি

---

[1] আবূ দাউদ, হাদীস নং (৩২৫১)।

[2] আবূ দাউদ, হাদীস নং (৩২৫৩)।

[3] বুখারী, আবদুল্লাহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন (নং: ২৬৭৯), এবং মুসলিম (নং: ১৬৪৬)।

তা হচ্ছে ছোট শির্ক। তা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে, তিনি বলেন: রিয়া (লোক দেখানো)।”[1] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন:

«لَا تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ فُلَانٌ، وَلَكِنْ قُولُوا مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شَاءَ فُلَانٌ».

“তোমরা বলো না যে, আল্লাহ যা চান এবং অমুক লোক যা চায়। বরং তোমরা বলো, আল্লাহ যা চান, অতঃপর অমুক যা চায়।”[2] সুনানে নাসায়ী ইবনু আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহুমা সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তি বললেন: হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ ও আপনি যা চান। তখন তিনি বললেন:

«أَجَعَلْتَنِي لِلَّهِ نِدًّا، بَلْ مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ».

“তুমি কি আমাকে আল্লাহর শরীক বানালে? বরং আল্লাহ একাই যা চেয়েছেন।”[3]

এই হাদীসগুলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাওহীদ সুরক্ষা এবং তার উম্মাতকে ছোট-বড় সকল প্রকারের শিরক থেকে সতর্ক করার প্রতি ইঙ্গিত করে। এবং (এটাও প্রমাণ করে যে,) তিনি তাদের ঈমানের নিরাপত্তা, আল্লাহর শাস্তি ও অসন্তুষ্টির কারণ থেকে মুক্তির জন্য উদ্বিগ্ন ছিলেন। আল্লাহ

---

[1] এটি আহমাদ বর্ণনা করেছেন (৫/৪২৮)।

[2] আবূ দাউদ, হাদীস নং (৪৯৮০)

[3] সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং (২১১৭)।

তাকে এর উত্তম প্রতিদান দান করুন, কেননা তিনি যথাযথভাবে পৌঁছে দিয়েছেন, সতর্ক করেছেন এবং আল্লাহ ও তাঁর বান্দাদের জন্য আন্তরিক উপদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তার প্রতি কিয়ামাত পর্যন্ত চিরস্থায়ী শান্তি ও রহমত বর্ষণ করুন।

আল্লাহর পবিত্র নগরী ও তাঁর সম্মানিত রাসূলের শহরে (মদীনাতে) বসবাসকারী ও সেখানে হজ পালনকারী আলিমদের কর্তব্য হলো—তারা যেন মানুষকে আল্লাহ যে শরী'আত দান করেছেন তা শিক্ষা দেন এবং যেসব শিরক ও গুনাহ আল্লাহ হারাম করেছেন, তা থেকে সতর্ক করেন। তারা যেন এসব বিষয়ে প্রমাণসহ বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেন এবং স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করেন; যাতে তারা মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোতে আনতে পারে এবং তারা যেন এই দায়িত্ব পালন করে সেই কর্তব্য আদায় করেন, যা আল্লাহ তাদের ওপর অর্পণ করেছেন—অর্থাৎ বার্তা পৌঁছে দেওয়া ও স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ...﴾

স্মরণ করুন, যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল আল্লাহ তাদের প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন: 'অবশ্যই তোমরা তা মানুষের কাছে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করবে এবং তা গোপন করবে না।' [আলে ইমরান : ১৮৭]

এর উদ্দেশ্য হলো, এই উম্মাহর আলেমদের সতর্ক করা, যাতে তারা পূর্ববর্তী কিতাবধারীদের মতো সত্য গোপন করার পথ না অনুসরণ করে; যারা পার্থিব স্বার্থকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য দিয়েছিল। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ﴿١٥٩﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٠﴾﴾

নিশ্চয় যারা গোপন করে আমরা যেসব সুস্পষ্ট নিদর্শন ও হেদায়াত নাযিল করেছি, মানুষের জন্য কিতাবে তা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার পর, তাদেরকে আল্লাহ্ লা'নত করেন এবং লা'নতকারীগণও তাদেরকে লা'নত করেন।

তবে যারা তাওবা করেছে এবং নিজেদেরকে সংশোধন করেছে এবং সত্যকে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছে। অতএব, এদের তাওবা আমি কবুল করব। আর আমি অধিক তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু। [সূরা বাকারাহ : ১৫৯-১৬০] পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহ ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসসমূহ থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা‘আলার পথে দাওয়াত দেওয়া এবং বান্দাদের তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্যের প্রতি দিকনির্দেশনা প্রদান করা সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদাতসমূহের অন্তর্ভুক্ত এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এটি নবীগণ ও তাদের অনুসারীদের

পথ, যা কিয়ামাত পর্যন্ত চলমান থাকবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝٣٣﴾

আর তার চেয়ে কার কথা উত্তম যে আল্লাহর দিকে আহবান জানায় এবং সৎকাজ করে। আর বলে, 'অবশ্যই আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত।' [ফুসসিলাত: ৩৩] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝١٠٨﴾

বলুন, 'এটাই আমার পথ, আল্লাহ্‌র প্রতি মানুষকে আমি ডাকি জেনে-বুঝে, আমি এবং যারা আমার অনুসরণ করেছে তারাও। আর আল্লাহ্ কতই না পবিত্র মহান এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।' [ইউসূফ: ১০৮]

আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ».

"যে ব্যক্তি কোনো কল্যাণের পথ দেখালো, তার জন্য রয়েছে আমলকারীর সমপরিমাণ সাওয়াব।"[1]

«لَأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ».

---

[1] সহীহ মুসলিম (নং: ১৮৯৩)।

"নিশ্চয়ই, তোমার মাধ্যমে একজন লোক হিদায়াতপ্রাপ্ত হওয়া লাল উটের (মালিক হওয়ার) থেকেও উত্তম।"[1] এ বিষয়ে অনেক আয়াত ও হাদীস রয়েছে।

অতএব, জ্ঞান ও ঈমানের অধিকারীদের জন্য উচিত যে, তারা আল্লাহ তা'আলার পথে দাওয়াত দেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের প্রচেষ্টা দ্বিগুণ করবে এবং বান্দাদের মুক্তির উপায়সমূহের প্রতি দিক-নির্দেশনা প্রদান করবে, একই সঙ্গে ধ্বংসের কারণসমূহ থেকে তাদেরকে সতর্ক করে। বিশেষ করে এই যুগে, যখন প্রবৃত্তির অনুসরণ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, ধ্বংসাত্মক মতবাদ ও বিভ্রান্তিকর স্লোগান ছড়িয়ে পড়েছে, হিদায়াতের আহ্বানকারী হ্রাস পেয়েছে এবং নাস্তিকতা ও অবাধ স্বাধীনতার প্রচারকারীরা সংখ্যায় বেড়ে গেছে। আল্লাহই সাহায্যকারী, আর মহান ও পরাক্রমশীল আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে কোনো শক্তি ও ক্ষমতা নেই।

অধ্যায়

নেক আমলের পাথেয় সংগ্রহ করা মুস্তাহাব সম্পর্কিত আলোচনা

হাজীগণের জন্য মক্কায় থাকাকালীন সম্পূর্ণ সময় আল্লাহর যিকির ও তাঁর আনুগত্য, এবং নেক কাজের মধ্যে মশগুল থাকা

[1] সহীহ বুখারী (নং: ৩০০৯), সহীহ মুসলিম (নং: ২৪০৬)।

মুস্তাহাব। বেশী বেশী নফল সালাত ও আল্লাহর ঘরের তাওয়াফ করা মুস্তাহাব। যেহেতু হারামে নেকীর কাজের ছাওয়াব কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে দেওয়া হয়, আর সেখানে গুনাহসমূহ অনেক বড় ও ভয়ানক অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয়। তেমনিভাবে তাদের জন্য আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি বেশি বেশি সালাত ও সালাম পাঠ করাও মুস্তাহাব।

যখন হাজীগণ মক্কা থেকে বের হওয়ার ইচ্ছা করবেন, তখন তাদের জন্য বায়তুল্লাহতে বিদায়ী তাওয়াফ করা ওয়াজিব। যাতে তাদের শেষ কাজ বায়তুল্লাহর তাওয়াফ হয়, তবে হায়েয ও নেফাসগ্রস্থ নারীরা ব্যতীত; তাদের জন্য বিদায়ী তাওয়াফ জরুরী নয়। দলীল হল: আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত হাদীস, তিনি বলেছেন:

«أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالبَيْتِ، إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ المَرْأَةِ الحَائِضِ».

“মানুষদেরকে আদেশ দেওয়া হয়েছে, যেনো তাদের সর্বশেষ অঙ্গীকার বায়তুল্লাহর নিকট হয়। তবে তবে ঋতুবতী নারীর জন্য এ বিষয়ে শিথিল (মাফ) করা হয়েছে।”[1]

যখন বায়তুল্লাহর বিদায় পর্ব শেষ হবে এবং মাসজিদ থেকে বের হওয়ার ইচ্ছা করবে, তখন সরাসরি সামনের দিকে হেঁটে

[1] সহীহ বুখারী (নং: ১৭৫৫), মুসলিম (নং: ১৩২৮)।

অগ্রসর হবে। পেছনের দিকে ফিরে হেঁটে আসা উচিত নয়, যেহেতু এটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ থেকে সাব্যস্ত হয়নি। বরং এটা নব্যসৃষ্ট বিদ‘আতের অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ».

“যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করলো যাতে আমাদের নির্দেশনা নেই, তা প্রত্যাখ্যাত হবে।”[1] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন:

«إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ».

“তোমরা অবশ্যই নবসৃষ্ট বিষয়সমূহ থেকে দূরে থাকবে; কেননা প্রতিটি নবসৃষ্ট বিষয় বিদ‘আত আর প্রতিটি বিদ‘আত ভ্রষ্টতা।”[2]

আমরা আল্লাহর নিকট তাঁর দীনের উপরে অবিচলতা কামনা করছি। তাঁর দীনের সাথে সাংঘর্ষিক কোনো কাজে লিপ্ত হওয়া থেকে নিরাপত্তা কামনা করছি। নিশ্চয় তিনি দানশীল ও মহৎ।

অধ্যায়

যিয়ারাতের আদব ও আহকামসমূহের আলোচনা

হজের পূর্বে বা পরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

[1] প্রাগুক্ত।

[2] মুসলিম, জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ রদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে (নং: ৮৬৭)।

মাসজিদ যিয়ারত করা সুন্নাহ। যেহেতু এটি বুখারী ও মুসলিমের হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে যে, আবু হুরাইরা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا المَسْجِدَ الحَرَامَ».

"আমার এ মসজিদে সালাত আদায় করা অন্য মসজিদে এক হাজার সালাতের চেয়ে উত্তম, তবে মাসজিদুল হারাম ব্যতীত।"[1] এবং ইবনু 'উমার রদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا المَسْجِدَ الحَرَامَ».

"আমার এ মসজিদে সালাত আদায় করা অন্য মসজিদে এক হাজার সালাতের চেয়ে উত্তম, তবে মাসজিদুল হারাম ব্যতীত।"[2] সহীহ মুসলিম। আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا المَسْجِدَ الحَرَامَ، وَصَلَاةٌ فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ صَلَاةٍ فِي مَسْجِدِي هَذَا».

"আমার এই মাসজিদে একবার সালাত আদায় করা –

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস (১১৯০), সহীহ মুসলিম, হাদীস (১৩৯৪)।

[2] সহীহ মুসলিম (নং: ১৩৯৫)।

মাসজিদুল হারাম ব্যতীত – অন্য যেকোনো মাসজিদে এক হাজার সালাতের চাইতে অধিক শ্রেষ্ঠ। আর মাসজিদুল হারামের একবারের সালাত আমার এই মাসজিদে একশত বার সালাত আদায়ের চেয়ে অধিক শ্রেষ্ঠ" । ([১৪৮])[1] আহমাদ, ইবনু খুযাইমাহ ও ইবনু হিব্বান হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ রদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إِلَّا المَسْجِدَ الحَرَامَ، وَصَلَاةٌ فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ».

"মাসজিদুল হারাম ব্যতীত অপরাপর মাসজিদে সালাত আদায় অপেক্ষা আমার মাসজিদের সালাত হাজার গুণ শ্রেষ্ঠ। আর মাসজিদুল হারামে সালাত আদায় অন্যান্য মসজিদের তুলনায় এক লক্ষ গুণ উত্তম।"[2] আহমাদ ও ইবনু মাযাহ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এ ব্যাপারে আরো অনেক হাদীস রয়েছে।

যখন কোনো যিয়ারতকারী মসজিদে প্রবেশ করে, তখন তার জন্য সুন্নাত হলো ডান পা আগে প্রবেশ করানো এবং এই দোয়া বলা:

যার অর্থ: "আল্লাহর নামে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

[1] এটি আহমাদ বর্ণনা করেছেন, (৪/৫)।

[2] সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং (১৪০৬)।

সাল্লামের প্রতি দরুদ ও সালাম, আমি মহান আল্লাহ, তাঁর সম্মানিত চেহারা এবং তাঁর প্রাচীন ক্ষমতার আশ্রয় চাই অভিশপ্ত শয়তান থেকে। হে আল্লাহ, আমার জন্য আপনার দয়ার দরজাসমূহ খুলে দিন।"

অনুরূপভাবে অন্যান্য মসজিদে প্রবেশের সময়ও এই দু'আ পড়বে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদে প্রবেশের জন্য কোনো নির্দিষ্ট দু'আ নেই। এরপর সে দুই রাকাত সালাত আদায় করবে এবং দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্য আল্লাহর কাছে যা ইচ্ছা দু'আ করবে। আর যদি সে এই সালাত রওজা শরীফে আদায় করতে পারে, তবে তা উত্তম ও অধিক ফযীলতপূর্ণ। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الجَنَّةِ».

"আমার ঘর ও মিম্বার-এর মধ্যবর্তী স্থান জান্নাতের বাগানগুলোর একটি বাগান।"[1] এরপরে সালাত শেষ হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কবর যিয়ারত করবে এবং তার উভয় সঙ্গী আবু বকর ও উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা এর কবর যিয়ারত করবে। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

[1] বুখারী (হাদীস নং ১১৯৫), মুসলিম (হাদীস নং ১৩৯০), আব্দুল্লাহ বিন যায়দ আল মাযেনীর সূত্রে।

ওয়াসাল্লামের কবরের দিকে মুখ করে আদবের সাথে ও নিচুস্বরে তাকে সালাম দিবে। সালাম দেওয়ার পদ্ধতি হল: “আস সালামু ‘আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ, ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু” । এর দলীল হল- সুনানে আবু দাউদে হাসান সনদে আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ».

“কোন মুসলিম আমার উপর সালাম দিলে আল্লাহ তা‘আলা আমার নিকট আমার রূহটি ফেরত দেন যাতে আমি তার সালামের উত্তর দিতে পারি”।[1] যদি যিয়ারতকারী তার সালাম এভাবে দেয়: যার অর্থ: "হে আল্লাহর নবী, আপনার উপর সালাম বর্ষিত হোক, হে আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, আপনার উপরে শান্তি বর্ষিত হোক। হে সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুত্তাক্বীন, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর বার্তা পূর্ণাঙ্গরূপে পৌঁছে দিয়েছেন। আপনার দায়িত্ব পূর্ণ আমানতদারিতার সাথে আদায় করেছেন। উম্মতের জন্য কল্যাণ সাধন করেছেন। আল্লাহর পথে যথাযথরূপে জিহাদ করেছেন” তাহলে কোনো সমস্যা নেই।

[1] আবূ দাউদ, হাদীস নং (২০৪১)।

কারণ, এগুলো সবই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর গুণাবলী। সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দুরুদও পাঠ করবে। তাঁর জন্য দু'আ করবে। যেহেতু শরীয়তে তাঁর উপর সালাত ও সালাম উভয়টি একত্রে পাঠ করার নিয়ম রয়েছে। আল্লাহ তা'আলার এই বাণীর উপরে আমল করার জন্য:

﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٥٦﴾﴾

নিশ্চয় আল্লাহ নবীর প্রশংসা করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর জন্য দোআ-ইসতেগফার করেন। হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নবীর উপর সালাত পাঠ কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও। [সূরা আল-আহযাব: ৫৬] এরপরে আবু বাকর ও উমার রদিয়াল্লাহু আনহুমাকে সালাম দিবে। উভয়ের জন্য দু'আ করবে এবং সন্তুষ্টির কামনা করবে।

ইবনু উমার রদিয়াল্লাহু আনহুমা যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার উভয় সঙ্গীকে সালাম দিতেন, সাধারণত এতটুকুই বলতেন: "আস-সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ! আস-সালামু আলাইকা ইয়া আবা বাকর। আস সালামু আলাইকা ইয়া আবাতাহ।"

যার অর্থ: হে আল্লাহর রাসূল! আপনার উপরে সালাম বর্ষিত হোক, আবু বাকরের উপরে সালাম বর্ষিত হোক, এবং হে আমার

পিতা আপনার উপরে সালাম বর্ষিত হোক। এরপরে তিনি ফিরে যেতেন।

এই যিয়ারাত শুধুমাত্র পুরুষদের ক্ষেত্রেই বিধিসম্মত। মহিলাদের ক্ষেত্রে কবর যিয়ারাত বলে কিছু নেই। যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে , তিনি বলেছেন:

«لَعَنَ زُوَّارَاتِ الْقُبُورِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ».

"তিনি কবর যিয়ারাতকারী নারীদেরকে, এবং যারা কবরকে মাসজিদ বানায় ও যারা কবরের উপরে প্রদীপ জ্বালায় তাদেরকে অভিশাপ করেছেন।"[1]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাসজিদে সালাত আদায়, সেখানে দু'আ করা ইত্যাদি কাজের জন্য মদীনায় যাওয়ার ইচ্ছা করা জায়েয আছে। যা অন্য সকল মাসজিদের ক্ষেত্রেও জায়েয। এটা সকলের জন্যই জায়েয আছে। এই বিষয়ের দলীল পূর্বে উল্লেখিত হাদীসসমূহ।

যিয়ারাতকারীর জন্য সুন্নাহ হল পাঁচ ওয়াক্ত সালাত সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাসজিদে আদায় করবে। সেখানে বেশি বেশি দু'আ, যিকর ও নফল সালাত আদায় করবে।

---

[1] আবূ দাউদ, হাদীস নং (৩২৩৬)।

সেখানে অফুরন্ত ছাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে নফল ইবাদত করবে।

রওজা শরীফে বেশী বেশী নফল সালাত আদায় করা মুস্তাহাব। যেমনটি রওজার মহত্ব সম্পর্কিত পূর্বের সহীহ হাদীসসমূহে অতিবাহিত হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الجَنَّةِ».

“আমার ঘর ও মিম্বার-এর মধ্যবর্তী স্থান জান্নাতের বাগানগুলোর একটি বাগান।”[1]

আর ফরয সালাতের ক্ষেত্রে যিয়ারাতকারীর উচিত দ্রুত প্রস্তুতি গ্রহণ করা এবং দায়িত্বশীলতার সাথে প্রথম কাতারে দাঁড়ানো, যখনই সম্ভব হয়। যদিও সামনে অগ্রবর্তী হওয়ার ক্ষেত্রে অধিক ভীড়ের চাপ থাকে। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সহীহ হাদীসসমূহে প্রথম কাতারে দাঁড়ানোর ব্যাপারে উৎসাহ প্রদানের বিবরণ এসেছে। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا».

“যদি মানুষ জানত আযানে প্রথম কাতারের কী মহত্ব, অতঃপর এ জন্য লটারি ছাড়া কোনো উপায় না থাকলে তারা লটারিই করত।”[2] মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু

---

[1] প্রাগুক্ত।

[2] আবু সাঈদ খুদরী রদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে মুসলিম বর্ণনা করেছেন (নং: ৪৩৮)।

আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় সাহাবীগণকে বলেছেন:

«تَقَدَّمُوا فَأْتَمُّوا بِي وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ، وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَتَأَخَّرُ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى يُؤَخِّرَهُ اللهُ».

"তোমরা সামনে অগ্রসর হও। অতঃপর আমার অনুসরণ করো। আর তোমাদের পেছনের সারির লোকেরা তোমাদের অনুসরণ করবে। যে ব্যক্তি সর্বদা সালাত থেকে পেছনে থাকবে, আল্লাহ তাকে পিছিয়ে দিবেন।"[1] সহীহ মুসলিম।

তাছাড়া আবু দাউদ আয়িশা রদিয়াল্লাহু আনহা থেকে হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«لَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَتَأَخَّرُ عَنِ الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ حَتَّى يُؤَخِّرَهُ اللهُ فِي النَّارِ».

"একজন ব্যক্তি সালাতে সর্বদা প্রথম সারি থেকে পেছনে থাকলে এর পরিণতিতে আল্লাহ তাকে অবশেষে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন।"[2] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে, তিনি স্বীয় সাহাবীগণকে বলেছেন:

«أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قَالَ: يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الْأُوَلَ، وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ».

"তোমরা কি ফেরেশতাগণের ন্যায় সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে পার

---

[1] সহীহ বুখারী (নং: ৬১৫), সহীহ মুসলিম (নং: ৪৩৭)।

[2] মুসলিম, জাবির ইবনু সামুরাহ রদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে (নং: ৪৩০)।

না, যেভাবে তারা তাদের রবের নিকট দাঁড়ান? তারা বললেন: হে আল্লাহর রাসূল, কীভাবে তারা তাদের রবের নিকট সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ান? তিনি বললেন: তারা প্রথম সারিগুলো পূর্ণ করেন এবং সীসার ন্যায় নিশ্চিদ্রভাবে সারির মাঝখানের ফাঁকা জায়গা পূর্ণ করেন।"[1] এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

এ বিষয়ে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাসজিদ ও অন্যান্য মাসজিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, হোক তা যিয়ারাতের আগে অথবা পরে। প্রমাণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাহাবীদের সালাতের সারির ডান পাশকে গুরুত্ব দিতে উৎসাহিত করতেন। এটি সুস্পষ্ট যে, তার প্রাথমিক স্থাপিত মাসজিদের সারির ডান দিকটি রওজা শরীফার বাইরে অবস্থিত ছিল। অতএব, এতে বোঝা যায় যে, সালাতের প্রথম সারি ও এর ডান পাশকে গুরুত্ব দেওয়া রওজা শরীফাতে সালাত আদায়ের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ, এবং এগুলোর ব্যাপারে যত্নবান হওয়া রওজায় সালাত আদায়ের চেয়ে অধিক প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য। যে কেউ এ বিষয়ে বর্ণিত হাদীসসমূহ গভীরভাবে চিন্তা করলে এ বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা

---

[1] আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন (নং: ৬৭৯), এবং এর শব্দ হলো: "একদল লোক সর্বদা প্রথম কাতার থেকে পিছনের দিকে সরতে থাকবে। ফলে আল্লাহও তাদেরকে জাহান্নামের পিছন দিকে রাখবেন।

লাভ করবে। আল্লাহই তাওফীক দাতা।

কারো জন্য হুজরা স্পর্শ করা, চুম্বন করা বা এর চারপাশে তাওয়াফ করা বৈধ নয়; কারণ, এটি সালাফে সালেহীনদের থেকে বর্ণিত হয়নি। বরং এটি একটি নিন্দনীয় বিদ‘আত।

কারো জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কোনো প্রয়োজন পূরণ, সংকট দূরীকরণ, রোগ নিরাময় বা এ জাতীয় কোনো কিছু চাওয়া বৈধ নয়। কারণ, এসব কেবলমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছেই প্রার্থনা করা যায়। মৃত ব্যক্তির কাছে এসব চাওয়া আল্লাহর সাথে শিরক এবং অন্যের ইবাদাত করার শামিল।

ইসলাম ধর্ম মূলত দুটি মৌলিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত:

প্রথমত: আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদাত করা যাবে না।

দ্বিতীয়ত: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদ্ধতি ব্যতীত অন্য কোন পদ্ধতিতে ইবাদাত করা যাবে না।

এটাই মূলত ‘আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল’ এ কথার অর্থ।

একইভাবে কারোর জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে সুপারিশ দাবী করা জায়েয নেই। কারণ, এটা মহান আল্লাহ তা‘আলার মালিকানাধীন বিষয়। সুতরাং এটা একমাত্র তাঁর থেকেই চাইতে হবে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা

বলেছেন:

﴿قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا...﴾

বলুন, 'সকল সুপারিশ আল্লাহরই মালিকানাধীন...' [আয-যুমার: ৪৪]। সুতরাং আমরা বলব: হে আল্লাহ, আমার জন্য আপনার নবীর সুপারিশ কবুল করুন। আমার জন্য আপনার ফেরেশতাগণের সুপারিশ কবুল করুন। আপনার মুমিন বান্দাগণের সুপারিশ কবুল করুন। হে আল্লাহ, আমার জন্য আমার আমলসমূহের সুপারিশ কবুল করুন ইত্যাদি। তবে মৃতব্যক্তিদের থেকে কোনো কিছু চাওয়া জায়েয নেই। চাই তা সুপারিশ হোক বা অন্যকিছু। চাই তারা নবী হোক বা অন্য কেউ। কারণ, এটা শরী'আতসম্মত নয়। আর যেহেতু মৃতব্যক্তির জন্য শরী'আত ব্যতিক্রম নির্ধারণ করেছে এমন কিছু আমল ব্যতীত সকল আমলই বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

সহীহ মুসলিমে আবু হুরাইরা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ».

"যখন আদম সন্তান মৃত্যুবরণ করে, তার সকল আমলই বন্ধ হয়ে যায়। তিনটি আমল ব্যতীত: ১) সদক্বায়ে জারিয়াহ ২) অথবা

এমন বিদ্যা, যা দ্বারা অন্যের উপকার হয় ৩) অথবা এমন নেক সন্তান, যে তার জন্য দু‘আ করে” ।[1]

আর একমাত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তাঁর জীবদ্দশায় এবং কিয়ামাতের দিবসে সুপারিশের দাবি করা এই জন্য জায়িয আছে যে, তাকে এই অধিকার প্রদান করা হয়েছে। যেহেতু একমাত্র তিনিই সেইদিন সামনে অগ্রসর হয়ে তাঁর রবের নিকট সুপারিশ করার অনুমতি চাইবেন। আর দুনিয়ার বিষয়টি তো স্পষ্ট, দুনিয়ার সুপারিশ তাঁর জন্য নির্দিষ্ট নয়। বরং এটা তাঁর জন্য এবং অন্যদের জন্যও সাব্যস্ত বিধায় একজন মুসলিম তার ভাইকে এই কথা বলতে পারে: আমার জন্য আমার রবের নিকট এই এই বিষয়ে সুপারিশ করুন। অর্থাৎ আমার জন্য আল্লাহর নিকট দু‘আ করুন। যার নিকট অনুরোধ করা হয়েছে, তার জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা এবং সুপারিশ করা জায়িয আছে। যদি সুপারিশের জন্য প্রস্তাবিত (যেই বিষয়ে সুপারিশের আবেদন করা হয়েছে) বিষয়টি আল্লাহর পক্ষ থেকে বৈধ সাব্যস্ত হয়ে থাকে।

আর কিয়ামাতের দিবসে আল্লাহর অনুমতির পূর্বে কারোর জন্য সুপারিশ করার অনুমতি নেই। যেমনটি আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿...مَنْ ذَا الَّذِى يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ...﴾

---

[1] আবু হুরাইরা রদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে মুসলিম বর্ণনা করেছেন (নং: ১৬৩১)।

কে সে, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর কাছে সুপারিশ করবে? [আল-বাকারাহ : ২৫৫]।

আর মৃত্যু একটি বিশেষ অবস্থা, যা জীবিত অবস্থার সঙ্গে বা পুনরুত্থানের পরের অবস্থার সঙ্গে তুলনা করা যায় না। কারণ, মৃত্যুর পর মানুষের সকল কাজ বন্ধ হয়ে যায় এবং সে তার কর্মফলেই আবদ্ধ থাকে, তবে শরী'আতে কিছু ব্যতিক্রম নির্ধারিত হয়েছে। মৃতদের কাছে সুপারিশ চাওয়া শরী'আতে অনুমোদিত ব্যতিক্রমগুলোর অন্তর্ভুক্ত নয়, তাই এটিকে সে তালিকায় যুক্ত করা বৈধ নয়।

নিঃসন্দেহে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যুর পর এমন এক বারযাখী (অন্তর্বর্তী) জীবনযাপন করছেন, যা শহীদদের জীবন থেকেও উন্নততর। তবে এটি তার দুনিয়ার জীবনের মতো নয়, আবার কিয়ামাতের দিনের জীবনের সঙ্গেও সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। বরং এটি এমন এক জীবন, যার প্রকৃতি ও প্রকৃত অবস্থা শুধুমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাই জানেন। এজন্যই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণী পূর্ববর্তী হাদীসে এসেছে:

«مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ». [١٢٢]

"কোন মুসলিম আমার উপর সালাম দিলে আল্লাহ তা'আলা আমার নিকট আমার রূহটি ফেরত দেন যাতে আমি তার

সালামের উত্তর দিতে পারি”।[1]

অতএব প্রমাণিত হয় যে, তিনি মৃত। আর তার রুহ তার দেহ থেকে পৃথক হয়ে গেছে। কিন্তু তার রুহকে তার নিকট ফিরিয়ে দেওয়া হয়, যখন তাকে সালাম দেওয়া হয়। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহর দলীলসমূহ স্পষ্ট। যা আলেমগণের মাঝে ঐকমত্যপূর্ণ বিষয়। কিন্তু এটা তার বারযাখী জীবনের বিপরীত কিছু নয়। ঠিক যেমন শহীদগণের মৃত্যু তাদের বারযাখী জীবনের বাস্তবতার বিপরীত নয়। যা আল্লাহ তা‘আলার বাণীতে বলা হয়েছে:

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ١٦٩﴾

আর যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে কখনোই মৃত মনে করো না; বরং তারা জীবিত এবং তাদের রবের কাছ থেকে তারা জীবিকাপ্রাপ্ত। [আলে-ইমরান : ১৬৯]

আমরা এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি, কারণ এর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে; যেহেতু দেখা যাচ্ছে অনেক মানুষ যারা এই পথ অনুসরণ করছে এবং আল্লাহ ছাড়া মৃতদের ইবাদাত ও শিরককে উৎসাহিত করছে। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, যেন তিনি আমাদের এবং সকল মুসলিমদেরকে তাঁর শরী‘আতের

[1] আবূ দাউদ, হাদীস নং (২০৪১)।

বিরুদ্ধে যাওয়া সব কিছু থেকে রক্ষা করেন। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

আর কিছু যিয়ারাতকারী, যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরের নিকট আওয়াজ উঁচু করে প্রার্থনা করেন, বা দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকেন, এটা শরী'আত বিরোধী কাজ। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা এই উম্মাতকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আওয়াজের উপরে তাদের আওয়াজের স্বরকে উঁচু করতে নিষেধ করেছেন এবং একে অন্যের সাথে কথা বলার সময় যেভাবে উঁচু স্বরে কথা বলা হয়, সেভাবে কথা বলতে নিষেধ করেছেন, আর তাঁর সামনে আওয়াজের স্বরকে নিচু করতে উৎসাহ দিয়েছেন। যা আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণীতে বর্ণিত হয়েছে:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۝٢ إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ۝٣﴾

হে ঈমানদারগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না এবং নিজেদের মধ্যে যেভাবে উচ্চস্বরে কথা বল তার সাথে সেরূপ উচ্চস্বরে কথা বলো না; এ আশঙ্কায় যে, তোমাদের সকল কাজ বিনষ্ট হয়ে যাবে অথচ তোমরা উপলব্ধিও করতে পারবে না।

নিশ্চয় যারা আল্লাহর রাসূলের সামনে নিজেদের কণ্ঠস্বর নিচু করে, আল্লাহ্ তাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য পরীক্ষা করে নিয়েছেন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার। [সূরা আল-হুজুরাত : ২-৩]।

আর যেহেতু তার কবরের সামনে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকা এবং বেশি বেশি সালাম দেওয়াটা ভীড়ের চাপ, শোরগোল এবং তাঁর – সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম – কবরের নিকট উঁচু আওয়াজের পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে। আর এটা আল্লাহর প্রণীত শরী'আতের বিরোধী, যা আল্লাহ তা'আলা এই মুহকাম আয়াতগুলোতে বলে দিয়েছেন। তিনি – সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম – জীবন্ত এবং মৃত উভয় অবস্থায় সম্মানিত। সুতরাং মুমিন ব্যক্তির জন্য তার কবরের নিকট এমন কাজ করা সমীচীন হবে না, যা শরয়ী আদবের পরিপন্থী।

একইভাবে কিছু যিয়ারাতকারী এমনও আছে, যারা তার কবরের নিকটে দাঁড়িয়ে কবরের দিকে মুখ করে দুই হাত উঠিয়ে দু'আ করার চেষ্টা করে। এই সকল কাজই সালফে সালিহীন অর্থাৎ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ, তাদের প্রকৃত অনুসারী তাবেঈগণের আদর্শ বিরোধী। বরং এটা নবসৃষ্ট বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي، تَمَسَّكُوا

بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ».

"তোমাদের উপর আবশ্যক হল আমার সুন্নাত ও হিদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাত পালন করা। আর তোমরা তা দাঁত দিয়ে শক্তভাবে কামড়ে ধরবে। অবশ্যই তোমরা নতুন সৃষ্ট (বিদ'আতী) কাজ পরিহার করবে। কারণ প্রতিটি নব আবিষ্কার হলো বিদ'আত এবং প্রতিটি বিদ'আত হলো ভ্রষ্টতা।"[1]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন:

«مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ».

"যে ব্যক্তি আমাদের এ দীনে নতুন কিছু আবিষ্কার করল যা তাতে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত।"[2]

«مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ».

"যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করলো যাতে আমাদের নির্দেশনা নেই, তা প্রত্যাখ্যাত হবে।"[3]

আলী ইবনুল হুসাইন যাইনুল আবিদীন রদিয়াল্লাহু আনহুমা এক ব্যক্তিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরের পাশে দু'আ করতে দেখলেন, তখন তিনি তাকে তা থেকে নিষেধ করলেন এবং বললেন: আমি কি তোমাকে এমন একটি হাদীস

[1] এটি আবু দাউদ সংকলন করেছেন, ইরবায ইবনু সারিয়াহ সূত্রে (হাদীস নং: ৪৬০৭)।

[2] প্রাগুক্ত।

[3] প্রাগুক্ত।

শুনাবো, যা আমি আমার পিতা থেকে, তিনি আমার দাদা থেকে, আর তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছেন? সেটি হলো তিনি বলেছেন:

«لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا، وَلَا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّ تَسْلِيمَكُمْ يَبْلُغُنِي أَيْنَمَا كُنْتُمْ».

"তোমরা আমার কবরকে উৎসবস্থল বানিও না, এবং তোমাদের ঘরগুলোকে কবর বানিও না। তবে আমার উপর সালাম পাঠ করো, কেননা তোমাদের সালাম আমার কাছে পৌঁছায়, যেখানেই তোমরা থাকো।"[1]

একইভাবে কিছু যিয়ারাতকারী এমন আছে, যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সালাম দেওয়ার সময় সালাত আদায়কারীর ন্যায় বুকের উপরে বা নিচে ডান হাত বাম হাতের উপরে রেখে সালাম দেয়। নবী আলাইহিস সালামকে সালাম দেওয়ার সময় এই অবস্থায় দাঁড়ানো বৈধ নয়। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো বাদশা, নেতা বা অন্যদেরকেও এভাবে সালাম দেওয়া জায়িয নেই। যেহেতু এটা বিনয়, বিনম্রতা ও ইবাদাতের অবস্থা, যা একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারোর জন্য জায়েয নেই। যেমনটি হাফেয ইবনু হাজার ফাতহুল বারীতে

[1] যাইনুল আবিদীনের রিওয়ায়েতকে সম্মানিত শায়খ হাফেয মাকদিসীর দিকে নিসবত করেছেন, তবে তিনি হাদীসটি ঘটনা উল্লেখ না করে বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া হাদীসটি মুসনাদে আহমাদেও রয়েছে (২/৩৬৭)।

আলেমগণ থেকে বর্ণনা করেছেন। যে ব্যক্তি এই প্রেক্ষাপট সম্পর্কে একটি চিন্তা করবে, তার নিকট বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হবে। ঐ ব্যক্তির নিকটেও এটা স্পষ্টভাবে ধরা পড়বে, যার লক্ষ্য হবে সালাফে সালিহীনের পথ অনুসরণ।

আর যার উপরে পক্ষপাতিত্ব, প্রবৃত্তি, অন্ধ তাক্বলীদ এবং সালাফগণের নীতির প্রতি আহ্বানকারী দায়ীদের প্রতি কু-ধারণা প্রবলভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার বিষয়টি আল্লাহর নিকট অর্পিত। আল্লাহর নিকট তার জন্য এবং আমাদের জন্য এই প্রার্থনা করি যে, তিনি আমাদের জন্য হক্ককে অন্য সকল বস্তুর উপরে প্রাধান্য দেওয়ার হিদায়াত ও তাওফীক দান করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা হলেন সর্বোত্তম প্রার্থিত (যাঁর কাছে চাওয়া হয়) সত্ত্বা।

অনুরূপভাবে কিছু মানুষ দূর থেকে কবর শরীফেরত দিকে মুখ করে সালাম বা দু'আ পাঠ করে, তা পূর্ববর্তী উদাহরণের মতোই একটি নতুন সৃষ্টকর্ম (বিদ'আত)। মুসলিমের জন্য এটি ঠিক নয় যে, সে তার দীনে এমন কিছু তৈরি করবে যা আল্লাহ অনুমোদন করেননি। এ ধরনের কর্মকাণ্ডে সে প্রকৃত উদ্দেশ্য থেকে দূরে সরে যায় এবং বিদ্বেষের দিকে চলে যায়। এ বিষয়ে ইমাম মালিক রহমতুল্লাহি আলাইহি এই কাজ এবং এর মতো অন্যান্য কাজগুলিকে অস্বীকার করেছেন এবং বলেছেন: "এই

উম্মাতের শেষভাগের সংশোধন একমাত্র ঐ বিষয়গুলোর মাধ্যমেই সম্ভব, যেগুলো দ্বারা এই উম্মাতের প্রথম ভাগের সংশোধন হয়েছিল"।[1]

আর এই উম্মাতের প্রথম ভাগের সংশোধন যে একমাত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তার খুলাফায়ে রাশিদীন, তার সাহাবীগণ এবং তাদের প্রকৃত অনুসারীদের পথে চলার দ্বারাই কেবল সম্ভব হয়েছে এটা স্পষ্ট। সুতরাং এই উম্মাতের শেষভাগের সংশোধনও একমাত্র তাদের মত ও পথকে আঁকড়ে ধরা এবং সেই পথে চলার দ্বারাই সম্ভব হবে।

আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদেরকে তাদের দুনিয়া ও আখিরাতের সৌভাগ্য ও মুক্তি রয়েছে এমন কাজ করার তাওফীক দান করুন। নিশ্চয় তিনি দানশীল মহানুভব।

---

[1] "ইগাছাতুল লাহফান মিন মাসায়িদিশ শাইতান", ১/৩৬৩।

দৃষ্টি আকর্ষণ:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর যিয়ারাতের হুকুম

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবর যিয়ারাত করা কোনোভাবেই ওয়াজিব নয়, এবং এটি হজের শর্তও নয়, যেমনটি কিছু সাধারণ মানুষ ও তাদের মতো অন্যরা মনে করে। বরং এটি মুস্তাহাব শুধুমাত্র তার জন্য, যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাসজিদ যিয়ারাত করেছে বা এর নিকটে অবস্থান করছে।

আর যে ব্যক্তি মদীনা থেকে দূরে, তার জন্য শুধুমাত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর যিয়ারাতের উদ্দেশ্যে সফর করা বৈধ নয়। তবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র মাসজিদ যিয়ারাতের উদ্দেশ্যে সফর করা সুন্নাত। যখন কেউ মাসজিদে নববীতে পৌঁছাবে, তখন সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর শরীফ এবং তাঁর দুই সাথী (আবু বকর ও উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর কবরও যিয়ারাত করতে পারে। এটি মাসজিদে নববী যিয়ারাতের অধীন কাজ হিসেবেই অন্তর্ভুক্ত। এর ভিত্তি হলো সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে প্রমাণিত সেই হাদীস, যেখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: المَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِي

هَذَا، وَالمَسْجِدِ الأَقْصَى».

"তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও সফরের বন্দোবস্ত করা যাবে না: মসজিদুল-হারাম, আমার এ মসজিদ ও মসজিদে আক্সা"।[1]

যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবর বা অন্য কারও কবর যিয়ারাতের উদ্দেশ্যে সফর করা বৈধ হত, তাহলে তিনি নিজেই উম্মাতকে এ ব্যাপারে দিকনির্দেশনা দিতেন এবং এর ফযীলতের প্রতি উৎসাহিত করতেন। কারণ তিনি ছিলেন মানুষের মধ্যে সর্বাধিক সদুপদেশ দাতা, আল্লাহ সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত এবং তাঁর প্রতি সর্বাধিক ভীতি রাখতেন।

তিনি দীনের বাণী পরিপূর্ণভাবে পৌঁছে দিয়েছেন, উম্মাতকে সমস্ত কল্যাণের দিকে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন এবং সব ধরনের অকল্যাণ থেকে সতর্ক করেছেন। সুতরাং কীভাবে তা বৈধ হতে পারে, যখন তিনি নিজেই তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোনো স্থানে সফর করতে নিষেধ করেছেন? তিনি বলেছেন:

«لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا، وَلَا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنتُمْ».

"আমার কবরকে উৎসবস্থল হিসেবে গ্রহণ করো না, এবং তোমাদের ঘরগুলোকে কবরস্থানে পরিণত করো না। তবে আমার

---

[1] বুখারী, আবু হুরাইরা রদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে (নং: ১১৮৯), মুসলিম (নং: ১৩৯৭)।

উপর দরুদ পাঠ করো, কেননা যেখান থেকেই তোমরা দরুদ পাঠ করবে, তা আমার কাছে পৌঁছে যাবে।"[1]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর যিয়ারাতের উদ্দেশ্যে সফরকে শরী'আতসম্মত বলা হলে, সেটা তাঁর কবরকে উৎসবস্থলে পরিণত করার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এতে সেই নিষিদ্ধ কাজ সংঘটিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, যা থেকে তিনি নিজেই উম্মাতকে সতর্ক করেছিলেন, যেমন: অতিরিক্ত প্রশংসা করা ও বাড়াবাড়ি করা। বস্তুত, অনেক মানুষ এ বিশ্বাসের কারণে (তার কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা শরী'আতসম্মত) বাড়াবাড়িতে লিপ্ত হয়ে পড়েছে।

যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবর যিয়ারাতের উদ্দেশ্যে সফরকে শরী'আসম্মত বলেছেন, তারা যে হাদীসগুলোর ওপর ভিত্তি করে দলীল পেশ করেন, সেগুলোর সনদ দুর্বল, বরং কিছু হাদীস সম্পূর্ণ জাল। হাদীস বিশারদগণ যেমন: দারাকুতনী, বায়হাকী, হাফিয ইবন হাজার (রহিমাহুমুল্লাহ) এবং অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ এসব হাদীসের দুর্বলতা ও জাল হওয়ার বিষয়ে সতর্ক করেছেন। অতএব, এসব দুর্বল ও জাল হাদীসের মাধ্যমে সহীহ হাদীসের বিরোধিতা করা কখনোই বৈধ নয়, বিশেষ করে সেই সহীহ হাদীসগুলোর, যেখানে স্পষ্টভাবে তিনটি মাসজিদ ব্যতীত

---

[1] প্রাগুক্ত।

অন্য কোথাও সফর করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

এখন, প্রিয় পাঠক, আমি তোমাকে এই বিষয়ে কিছু জাল হাদীস উপস্থাপন করছি, যাতে তুমি এগুলো চিনে নিতে পারো এবং এগুলোর কারণে বিভ্রান্ত না হয়ে সতর্ক থাকতে পারো:

এক: "যে ব্যক্তি হজ করেছে এবং আমাকে যিয়ারাত করেনি, সে আমার সাথে দুর্ব্যবহার করেছে।"

দুই: “যে ব্যক্তি আমাকে আমার মৃত্যুর পরে যিয়ারাত করল, সে যেন আমাকে জীবিত অবস্থায়ই যিয়ারাত করল।”

তিন: "যে ব্যক্তি আমাকে (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে এবং আমার পিতা ইবরাহিম (আলাইহি সালাম)-কে একই বছরে য়িয়ারাত করবে, আমি তাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে জান্নাতের নিশ্চয়তা দিচ্ছি।"

চার: "যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারাত করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত আবশ্যক হবে।"

এই হাদীসগুলো এবং এর মত অন্যান্য হাদীসগুলোর মধ্যে থেকে কোনো একটি হাদীসও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত হয়নি।

হাফিয ইবনু হাজার তার “আত-তালখীস” গ্রন্থে -অধিকাংশ বর্ণনা উল্লেখ করার পরে- বলেছেন: এ হাদীসের সকল সনদই দূর্বল।

হাফিয ‘উকাইলী বলেছেন: এ জাতীয় কোন হাদীসই সহীহ নয়।

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লাহ জোড়ালোভাবে ঘোষণা করেছেন যে, এই সবগুলো হাদীসই জাল। এবং এজন্য এগুলো সম্পর্কে জানা, আয়ত্ব করা এবং গভীর পর্যবেক্ষণই যথেষ্ট।

যদি এ ধরনের কোনো বিষয় শরী‘আতে প্রমাণিত হতো, তাহলে সাহাবীগণ রদিয়াল্লাহু ‘আনহুম নিঃসন্দেহে এ ব্যাপারে সর্বপ্রথম আমল করতেন, উম্মতের সামনে তা স্পষ্ট করতেন এবং তাদেরকে সে বিষয়ে আহ্বান জানাতেন। কেননা নবীগণের পর তারাই সর্বোত্তম মানুষ, তারা আল্লাহর সীমারেখা ও তাঁর বান্দাদের জন্য নির্ধারিত বিধান সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞানী এবং আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টির জন্য সবচেয়ে বেশি শুভাকাঙ্ক্ষী। কিন্তু যখন তাদের পক্ষ থেকে এ ধরনের কোনো কিছু বর্ণিত হয়নি, তখন এটি প্রমাণ করে যে, এটি শরী‘আতে অনুমোদিত নয়।

যদি এসব বিষয়ের কোনো কিছু সহীহ হতো, তাহলে তা এমন শরী‘আতসম্মত যিয়ারাতের অর্থে গ্রহণ করা হতো, যাতে শুধু কবর যিয়ারাতের উদ্দেশ্যে সফর করা অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং সকল হাদীসের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য তা করা হতো। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা সর্বজ্ঞ।

অধ্যায়

মাসজিদে কুবা ও বাকী কবরস্থান যিয়ারাত মুস্তাহাব হওয়া প্রসঙ্গে

মদীনার যিয়ারাতকারীর জন্য কুবা মাসজিদ যিয়ারাত করা এবং সেখানে সালাত আদায় করা মুস্তাহাব। এই বিষয়ের দলীল হল: সহীহ বুখারী ও মুসলিমে ইবনু উমার রদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন:

«كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَزُورُ مَسْجِدَ قُبَاءٍ رَاكِبًا وَمَاشِيًا وَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ».

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুবা মাসজিদ আরোহী অবস্থায় ও পায়ে হেঁটে যিয়ারাত করতেন এবং সেখানে দুই রাক‘আত সালাত আদায় করতেন”।[1]

সাহল বিন হুনাইফ রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى مَسْجِدَ قُبَاءٍ فَصَلَّى فِيهِ صَلَاةً كَانَ لَهُ كَأَجْرِ عُمْرَةٍ».

“যে ব্যক্তি নিজের ঘরে পবিত্রতা অর্জন করলো, অতঃপর কুবা মাসজিদে এসে কোন সালাত পড়লো, তার জন্য একটি

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস (১১৯৩), সহীহ মুসলিম, হাদীস (১৩৯৯)।

উমরাহর সমান সাওয়াব রয়েছে।”[1]

তার জন্য বাক্বীর কবরগুলো যিয়ারাত করা সুন্নাহ। শহীদগণের কবরসমূহ এবং হামযাহ রদিয়াল্লাহু আনহুর কবর যিয়ারাত করা সুন্নাহ। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কবর যিয়ারাত করতেন এবং তাদের জন্য দু‘আ করতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«زُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمْ بِالآخِرَةِ».

“তোমরা কবর যিয়ারাত করো। কারণ, তা তোমাদেরকে আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।”[2] সহীহ মুসলিম।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণকে কবর যিয়ারাত করার সময় এই দু‘আ শিক্ষা দিতেন:

«السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ».

অর্থ: “তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, হে মুমিন মুসলিম ক্ববরবাসীগণ। আমরা ইনশা আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে মিলিত হবো। আল্লাহর নিকট তোমাদের জন্য এবং আমাদের জন্য নিরাপত্তা কামনা করছি”।[3] হাদীসটি ইমাম মুসলিম সালমান বিন বুরায়দাহ থেকে, তিনি তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

---

[1] সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং (১৪১২)।

[2] সহীহ মুসলিম, হাদীস (৯৭৬)।

[3] সহীহ মুসলিম (নং: ৯৭৫)।

ইমাম তিরমিযী ইবনু আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহুমা সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার কবরগুলো অতিক্রম করার সময়ে তাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন:

«السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ القُبُورِ، يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ، أَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالأَثَرِ».

“হে কবরের অধিবাসীরা, তোমাদের উপরে সালাম। আল্লাহ আমাদেরকে এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করুন। তোমরা আমাদের থেকে অগ্রগামী আর আমরা পরবর্তীতে আগমনকারী।”[1]

এই হাদীসগুলো থেকে বুঝা যায় যে, শরয়ী পদ্ধতিতে কবর যিয়ারাতের উদ্দেশ্য হল আখিরাতের স্মরণ, মৃতব্যক্তিদের প্রতি অনুগ্রহ দেখানো এবং তাদের জন্য দু‘আ করা ও তাদের জন্য আল্লাহর রহমত কামনা করা।

আর কবর যিয়ারাত যদি এই উদ্দেশ্যে হয় যে, সেখানে দু‘আ করা হবে, অথবা সেখানে দীর্ঘ সময় অবস্থান করা হবে, বা কবরবাসীর নিকট প্রয়োজন পূরণ করার দাবী জানানো হবে, অথবা অসুস্থ ব্যক্তিদের আরোগ্য প্রার্থনা করা হবে, অথবা তাদের অসীলায় বা তাদের মর্যাদার অসীলায় আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা হবে- তাহলে নিঃসন্দেহে এটা জঘন্য বিদ‘আত যা আল্লাহ এবং

[1] তিরমিযী, হাদীস নং (১০৩৫)।

তাঁর রাসূলের শরী‘আহ বহির্ভূত কাজ। যা সালফে সালিহীন রদিয়াল্লাহু আনহুম করেননি। বরং এটা পরিত্যাক্ত বলে গণ্য হবে, যা করা থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। এমনকি তিনি বলেছেন:

«زُورُوا الْقُبُورَ، وَلَا تَقُولُوا هُجْرًا».

“তোমরা কবর যিয়ারাত করো। তবে সেখানে যেয়ে নিকৃষ্ট কথা বলো না।”[1]

এই বিষয়গুলো বিদ‘আত হওয়ার দিক থেকে সবগুলো একই সারিতে অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু বিষয়গুলো স্তরের দিক থেকে ভিন্ন ভিন্ন। কিছু বিষয় শুধু বিদ‘আত, শিরক নয়, যেমন: কবরের কাছে যেয়ে আল্লাহর নিকট দু‘আ করা এবং মৃতব্যক্তির দোহাই দিয়ে বা তার মর্যাদার অসীলা দিয়ে আল্লাহর নিকট কিছু প্রার্থনা করা, ইত্যাদি। এর মধ্যে কিছু বিষয় শিরকে আকবারের পর্যায়ে, যেমন: মৃতব্যক্তিদের নিকট প্রার্থনা করা বা তাদেরকে আহবান করা, এবং তাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা।

এই বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা ইতোপূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। সুতরাং এই বিষয়ে সাবধান ও সজাগ থাকুন। আপনার রবের নিকট সত্যের পথে থাকার তাওফীক্ব ও হেদায়েত কামনা করুন। একমাত্র মহান আল্লাহই তাওফীক্ব দানকারী এবং

---

[1] মুসলিম, ইবনু বুরাইদাহ সূত্রে, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন (নং: ৯৭৭)।

হেদায়েতের মালিক। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো সত্য মা'বুদ নেই। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো রব নেই।

এতটুকুই লিপিবদ্ধ করা আমাদের উদ্দেশ্য ছিল। শুরুর এবং শেষের সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর। বিচার দিবস পর্যন্ত আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর বান্দা ও রাসূল, তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ মাখলুক মুহাম্মাদের প্রতি এবং তার পরিবারবর্গ এবং তার সাহাবীগণের প্রতি।

***

সূচিপত্র

হজ্জ, ‘উমরাহ এবং যিয়ারাতের বিভিন্ন মাসআলা সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ। 2

লেখকের ভূমিকা 2

অধ্যায়: 5

হজ ও ‘উমরাহ ওয়াজিব হওয়া এবং উভয়টি দ্রুত সম্পন্নকরণের অত্যাবশ্যকীয়তা সম্পর্কিত দলীলসমূহের আলোচনা সম্পর্কে 5

অধ্যায় 10

পাপ থেকে তাওবাহ করা ও জুলুম থেকে মুক্ত হওয়ার অপরিহার্যতা সম্পর্কে 10

অধ্যায় 18

মীকাতের কাছে পৌঁছে হাজীর করণীয় সংক্রান্ত 18

অধ্যায় 26

স্থানগত মীকাত ও তা নির্দিষ্টকরণ সংক্রান্ত 26

অধ্যায় 33

যে ব্যক্তি হজের মাসের বাইরে মীকাতে পৌঁছায়, তার হুকুম সম্পর্কে 33

অধ্যায় 38

বাচ্চাদের হজ কী ইসলামের ফরয হজের ক্ষেত্রে যথেষ্ট হবে? 38

অধ্যায় 42

ইহরামের নিষিদ্ধ কাজসমূহ এবং মুহরিম ব্যক্তির জন্য বৈধ বিষয়াবলীর বর্ণনা 42

অধ্যায় 52

হাজী মক্কায় প্রবেশের পর যা করবেন এবং মসজিদুল হারামে প্রবেশের পর তাওয়াফ ও তার পদ্ধতি সম্পর্কে বিবরণ।..52
অধ্যায়..65
যিলহজের ৮ তারিখে হজের ইহরাম বাঁধা ও মিনায় গমনের হুকুম.....65
অধ্যায়..92
কুরবানির দিনে হাজীর জন্য সর্বোত্তম করণীয় সংক্রান্ত আলোচনা.......93
অধ্যায়..101
কিরান ও তামাত্তু হজ আদায়কারীর জন্য দম (কুরবানী) আবশ্যক হওয়ার আলোচনা..101
অধ্যায়..105
হাজী ও অন্যান্যদের উপর সৎকাজের আদেশ করা ওয়াজিব হওয়ার আলোচনা..105
অধ্যায়..117
নেক আমলের পাথেয় সংগ্রহ করা মুস্তাহাব সম্পর্কিত আলোচনা.......117
অধ্যায়..119
যিয়ারাতের আদব ও আহকামসমূহের আলোচনা..............................119
দৃষ্টি আকর্ষণ: 140
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর যিয়ারাতের হুকুম..........140
অধ্যায়..145
মাসজিদে কুবা ও বাকী কবরস্থান যিয়ারাত মুস্তাহাব হওয়া প্রসঙ্গে....145

***

رئاسة الشؤون الدينية
بالمسجد الحرام والمسجد النبوي

رسالة الحرمين

হারামাইন বার্তা

উল-হারাম এবং মসজিদে নববী অভিমুখী যাত্রীদের জন্য নির্দেশিকা বিষয়বস্তু বিভিন্ন ভাষায়.